(রোযার মাসায়েল, তরবিয়তী ও স্বাস্থ্য-
সংক্রান্ত তথ্যাবলী)

كيف نستقبل رمضان؟

(باللغة البنغالية)

(فوائد فقهية وتوجيهات تربوية ومعلومات طبية)

ترجمة : عبد الحميد الفيضي

ভাষান্তরে ঃ-

আব্দুল হামীদ ফায়যী

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينـــا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

একটি রোযার বই থাকতে আবার কেন এ বই? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। আসলে এ বই-এ কিছু নতুন জিনিস আছে, যা ঐ বই-এ নেই। রোযা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কিছু গবেষণার কথা, রোযা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় কথা, রোযা ও রমণীর কথা, রোযা ও শিশুর কথা এবং রোযা ও ধূমপায়ীর কথা এই পুস্তিকার নতুন আকর্ষণ।

আশা করি সুহৃদ পাঠকবৃন্দ পড়ে উপকৃত হবেন এবং দুআ করবেন তাদের জন্য, যারা এর প্রণয়নে পরিশ্রম করেছেন।

মহান আল্লাহ যেন আমাদের প্রচেষ্টা, আমাদের নামায-রোযা কবুল করে নিন এবং মরণের পর ‘রাইয়ান’ জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করেন। আমীন।

বিনীত-

আব্দুল হামীদ ফাইযী

আল-মাজমাআহ

সঊদী আরব

শা’বান ১৪২৭ হিজরী

রোযার ফযীলত

সাধারণভাবে রোযার ফযীলত বর্ণনা করে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কতিপয় সহীহ হাদীস প্রণিধানযোগ্য ঃ-

১। হযরত আবু হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য; তবে রোযা নয়, যেহেতু তা আমারই জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।' রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের কারো রোযার দিন হলে সে যেন অশ্লীল না বকে ও ঝগড়া-হৈচৈ না করে; পরন্তু যদি তাকে কেউ গালাগালি করে অথবা তার সাথে লড়তে চায়, তবে সে যেন বলে, 'আমি রোযা রেখেছি, আমার রোযা আছে।' সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ আছে! নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর সুবাস অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধময়। রোযাদারের জন্য রয়েছে দু'টি খুশী, যা সে লাভ করে; যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারী নিয়ে খুশী হয়। আর যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তার রোযা নিয়ে খুশী হবে। *(বুখারী ১৯০৪, মুসলিম ১১৫১ নং)*

২। হযরত হুযাইফা ﵁ বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে ঘটিত বিভিন্ন ফিতনা ও গোনাহর কাফ্ফারা হল নামায, রোযা ও

সদকাহ।” *(বুঃ ১৮৯৫, মুঃ ১৪৪নং)*

৩। হযরত সাহ্ল বিন সা’দ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, জান্নাতের এক প্রবেশদ্বার রয়েছে, যার নাম ‘রাইয়ান।’ কিয়ামতের দিন ঐ দ্বার দিয়ে রোযাদারগণ প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া তাদের সাথে আর কেউই ঐ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে না। বলা হবে, ‘কোথায় রোযাদারগণ?’ সুতরাং তারা ঐ দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। অতঃপর যখন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তখন সে দ্বার রুদ্ধ করা হবে। ফলে সে দ্বার দিয়ে আর কেউই প্রবেশ করতে পারবে না।” *(বুঃ ১৮৯৬ নং, মুঃ ১১৫২ নং, নাঃ, তিঃ)*

৪। হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “রোযা হল জাহান্নাম থেকে রক্ষার জন্য ঢাল ও দুর্ভেদ্য দুর্গস্বরূপ।” *(আঃ, বাঃ শুআবুল ঈমান, সজাঃ ৩৮৮০নং)*

৫। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “কিয়ামতের দিন রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি ওকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।’ আর কুরআন বলবে, ‘আমি ওকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।’ নবী ﷺ বলেন, “অতএব ওদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।” *(আঃ, ত্বাবাঃ কাবীর, হাঃ, ইবনে আবিদ্দুনয়্যার ‘কিতাবুল জু’, সতাঃ ৯৬৯ নং)*

রোযার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, উপকারিতা ও যৌক্তিকতা

মহান আল্লাহর ৯৯ এর অধিক সুন্দর নামাবলীর অন্যতম নাম হল 'আল-হাকীম।' 'আল-হাকীম' অর্থ হিকমত-ওয়ালা, বিজ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়। আর হিকমত ও প্রজ্ঞা হল সর্বকর্ম যথাযোগ্যভাবে নৈপুণ্যের সাথে সম্পাদন করা। মহান আল্লাহর এই নামের দাবী এই যে, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন অথবা মানুষের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তার প্রত্যেকটার পশ্চাতে আছে পরিপূর্ণ যুক্তি ও হিকমত; তা কেউ বুঝতে সক্ষম হোক অথবা অক্ষম।

যে রোযা আল্লাহ তাআলা বান্দার উপর ফরয ও বিধিবদ্ধ করেছেন তার মাঝে রয়েছে অভাবনীয় যৌক্তিকতা ও অচিন্তনীয় উপকারিতা। যেমন ঃ-

১। রোযা হল এক এমন ইবাদত, যার মাধ্যমে বান্দা প্রভুর নৈকট্যলাভ করতে সক্ষম হয়। এতে সে প্রকৃতিগতভাবে যে জিনিস ভালোবাসে তা বর্জন করে; বর্জন করে সকল প্রকার পানাহার ও যৌনক্রিয়া। আর এর মাধ্যমে সে নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনা করে। আশা করে পরকালের সাফল্য ও বেহেশ্তলাভ। এতে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, সে নিজের প্রিয় বস্তুর উপর প্রভুর প্রিয় বস্তুকে প্রাধান্য দেয় এবং ইহকালের জীবনের উপর পরকালের জীবনকেই শ্রেষ্ঠত্ব দেয়।

২। রোযাদার যথানিয়মে রোযা পালন করলে রোযা তাকে মুত্তাকী

ও পরহেযগার বানাতে সহায়ক হয়। তার জীবন পথে তাকওয়া ও পরহেযগারীর আলো বিচ্ছুরিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।" *(কুঃ ২/১৮৩)*

সুতরাং রোযাদার রোযা রেখে তার জীবনের প্রত্যেক চিন্তা, কথা ও কর্মে 'তাকওয়া' আনবে -এটাই বাঞ্ছিত। আর 'তাকওয়া' হল সেই আল্লাহ-ভীতির নাম, যার মাধ্যমে বান্দা তাঁর সকল আদেশ যথাসাধ্য পালন করে চলবে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কর্ম থেকে সুদূরে থাকবে। বলা বাহুল্য, এটাই হল রোযার মহান উদ্দেশ্য ও প্রধান লক্ষ্য। পানাহার ও যৌনক্রিয়া নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে মানুষকে বৃথা কষ্ট দেওয়া রোযার উদ্দেশ্য নয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা ও তার উপর আমল ত্যাগ করতে পারল না, সে ব্যক্তির পানাহার ত্যাগ করার মাঝে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" *(বুঃ ৬০৫৭, ইমাঃ ১৬৮৯, আঃ ২/৪৫২, ৫০৫, ফুসিতাযাঃ ৬-৭পৃঃ)*

৩। রোযা আত্মাকে তরবিয়ত দান করে, চরিত্রকে সভ্য ও আদর্শভিত্তিক করে গড়ে তোলে এবং রোযাদারের আচরণে উৎকৃষ্টতার স্থায়িত্ব আনয়ন করে। মুসলিমের স্বভাব-প্রকৃতিতে রোযা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। রোযার সংশোধনী বার্তা তার হৃদয়-মনে তাসীর রেখে যায়। রোযাদারের অন্তরে এমন জাগরণ সৃষ্টি করে এবং তার মনের দুয়ারে এমন অতন্দ্র প্রহরী খাড়া করে দেয় যে, সে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয় এবং এই

প্রহরীর চোখে ফাঁকি দিয়ে কোনও নৈতিকতা-বিরোধী কর্ম করতে ইচ্ছা ও চেষ্টাও করতে পারে না।

এটা কি করে হতে পারে যে, রোযাদার তার প্রতিপালকের নিকট সত্যবাদিতার পরিচয় দেবে, অথচ মানুষের সঙ্গে মিথ্যা বলবে? নিজের রোযায় আন্তরিকতা রাখবে, অথচ নিজ সমাজের সঙ্গে ধোকাবাজী ও কপটতা প্রদর্শন করবে? ইখলাস ও আন্তরিকতা একটি সামগ্রিক বস্তু; যা ভাগাভাগি হয় না। যার সর্বোচ্চ পর্যায় ও সারাংশ হল সৃষ্টিকর্তা অন্তর্যামী আল্লাহর সাথে আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধচিত্ততা। সুতরাং যে ব্যক্তির আল্লাহর সাথে আন্তরিকতা থাকবে, সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে অসম্ভব যে, সে মানুষকে ধোকা দেবে, আমানতে খেয়ানত করবে, অপরকে ঠকিয়ে খাবে, চুরি করবে, যুলম করবে অথবা অপরকে কষ্ট দেবে। পক্ষান্তরে যদি কারো চক্রান্তে পড়ে বা ভুলক্রমে এ ধরনের কোন পাপ করেই বসে, তাহলে সাথে সাথে সে সুপথে ফিরে আসে, আল্লাহর নিকট তওবা করে, অনুতপ্ত হয়, লজ্জিত হয় সীমাহীন।

সুতরাং রোযা হল একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুচরিত্র গঠনের উপকরণ এবং তা সমৃদ্ধকরণের জন্য আভ্যন্তরীণ এক মৌলিক উপাদান। আর বিদিত যে, বাহ্যিক সৌন্দর্যের বাহার কোন মূল্য রাখে না; যদি না অভ্যন্তর সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। তাই রোযাদারের জীবনে তার আখলাক-চরিত্র স্থায়িত্ব, স্থিতিশীলতা, বর্ধনশীলতা ও শ্রীবৃদ্ধিশীলতার গুণাবলী গ্রহণ করে থাকে। কারণ, তার সকল আচরণ ভিতর ও বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত হয়ে যায়।

(ফাইযঃ ২২৪পৃঃ)

৬। রোযা রোযাদারকে কুঅভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্তিদান করে। এমন বহু মানুষ আছে, যারা এমন বহু নোংরা অভ্যাসে অভ্যাসী হয়ে পড়ে এবং তার ফাঁদ থেকে বের হওয়ার কোন পথ খুঁজে পায় না। কিন্তু রোযা এলে তাদেরকে দেখা যায় যে, তারা তাদের সে সমস্ত কুঅভ্যাসকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করে ফেলেছে।

বলা বাহুল্য, এটাই হয় তাদের জন্য সুবর্ণ-সুযোগ; যার মাঝে তাদের সেই সকল মন্দ অভ্যাসের পঞ্জা থেকে নিজেদেরকে সহজ উপায়ে স্বাধীন করে নিতে পারে, যে সকল অভ্যাস তাদের মানসিক দুশ্চিন্তা ও ব্যাধির একমাত্র কারণ। *(সারাঃ ৪০পৃঃ)*

৯। রোযা পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ এবং তাঁর পূর্ণ দাসত্ব করার কথা শিক্ষা দেয়। রোযা মুসলিমকে প্রকৃত দাসত্বের অনুশীলন দেয়। তাই তো সে রাতের বেলায় খায়, পান করে। কারণ, তার প্রভু যে বলেছেন,

﴿ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। *(কুঃ ২/ ১৮৭)*

বলা বাহুল্য, এ জন্যই ইফতার ও সেহরীর সময় খাওয়া হল সুন্নত ও মুস্তাহাব এবং না খেয়ে একটানা পরপর কয়েকদিন রোযা রাখা মকরূহ। অতএব রোযা রাখার জন্য সেহরী খাওয়া এবং রোযার শেষে ইফতারী খাওয়া হল এক প্রকার আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর

নির্দেশের আনুগত্য।

তদনুরূপ ফজর উদয় হলে মুসলিম পানাহার সহ সেই সকল বস্তু ও বিষয় থেকে দূরে থাকে, যাতে রোযা নষ্ট করে ফেলে। আর এর মাঝেও সে একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব ও আনুগত্য করে। কারণ, তিনি বলেন,

﴿ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। *(কুঃ ২/১৮৭)* সুতরাং এইভাবে মুসলিম মহান আল্লাহর পূর্ণ দাসত্ব ও আনুগত্যের উপর দীর্ঘ প্রশিক্ষণ লাভ করে থাকে। *(দুরাঃ ১০পৃঃ)*

১১। রোযা হল গোনাহের কাফ্ফারা। কারণ, নেকীর কাজ গোনাহর কাজের গোনাহ নাশ করে দেয়। আর রোযা হল বড় নেকীর কাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় পুণ্যরাশি (সওয়াবের কাজ) পাপরাশিকে দূরীভূত করে। *(কুঃ ১১/১১৪)*

আর প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ ও প্রতিবেশী সংক্রান্ত পাপরাশিকে নামায, রোযা এবং সদকাহ মোচন করে দেয়।" *(বুঃ ১৭৯৬, মুঃ ১৪৪নং)* অর্থাৎ, মুসলিম যে গোনাহ তার পরিবারকে অন্যায়ভাবে উচ্চবাচ্য করে, কষ্ট দিয়ে অথবা কোন বিষয়ে তাদের প্রতি ত্রুটি ও অবহেলা প্রদর্শন করে, অথবা প্রতিবেশীকে কোন কথায় বা কাজে কোন প্রকার কষ্ট দিয়ে, অথবা

আর্থিক কোন প্রকার ত্রুটি ঘটিয়ে অথবা অনুরূপ অন্যান্য সাগীরা (ছোট) গোনাহ করে থাকে, সে সবকে তার নামায, রোযা এবং দান-খয়রাত মোচন করে দেয়।

১২। রোযা রোযাদারের মনে ধৈর্য ও সহনশীলতা সৃষ্টি করে। কষ্টে ধৈর্য ধারণ ও সহনশীলতা অবলম্বন করতে অভ্যাসী বানায়। রোযা তাকে তার প্রিয় বস্তু ব্যবহার বর্জন করতে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। যেমন শিক্ষা দেয় কাম-দমন ও মনের যথেচ্ছাচার দমন করার; যা নিশ্চয় সহজ কাজ নয়।

বলা বাহুল্য, রোযা পালনে রয়েছে ৩ প্রকার ধৈর্য। মহান আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য, তাঁর হারামকৃত বস্তু পরিহার করার উপর ধৈর্য এবং তাঁর নির্ধারিত তকদীরের বালা-মসীবতের উপর ধৈর্য। এই ৩ প্রকার ধৈর্য যে বান্দার মাঝে একত্রিত হবে, সেই হবে ইহকালে পরম সুখী এবং পরকালে আল্লাহর ইচ্ছায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝١٠ ﴾

অর্থাৎ, ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার ও সওয়াব দান করা হবে। *(কুঃ ৩৯/ ১০)*

১৯। রোযা রোযাদারের জন্য ইহ-পরকালের খুশী ও সুখের হেতু। যেমন মহানবী ﷺ বলেন, "রোযাদারের জন্য রয়েছে ২টি খুশী; প্রথম খুশী হল ইফতার করার সময় এবং দ্বিতীয় খুশী হল প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়।" *(বুঃ ১০৮৫, মুঃ ১১৫১নং)*

রোযাদারের ইফতার করার সময় যে খুশী, তা হল সেই সুখ ও তৃপ্তির একটি নমুনামাত্র; যা মুমিন ব্যক্তি নিজ প্রভুর আনুগত্য ও তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জন করে থাকে। আর প্রকৃতপ্রস্তাবে এটাই হল আসল সুখ। এই সুখ ও তৃপ্তি দুইভাবে অনুভূত হয়ে থাকে ঃ-

(ক) আল্লাহ তাআলা ঐ ইফতারের সময় রোযাদারের জন্য পানাহার বৈধ করে দিয়েছেন। আর নিঃসন্দেহে মানুষের প্রকৃতি এই যে, (বিশেষ করে খিদে থাকা অবস্থায়) খাবার দেখলে মন আনন্দে নেচে ওঠে। আর এ জন্যই তা বর্জন করা হল আল্লাহর ইবাদত।

(খ) সে মুহূর্তে রোযাদার তার একটি রোযা সম্পন্ন করে থাকে। সুতরাং আল্লাহর তওফীক অনুযায়ী সে সেদিনকার রোযা ও ইবাদত যে পালন ও পূর্ণ করতে পারল, তারই খুশী তার মনকে আন্দোলিত করে তোলে। *(দুরূঃ ১৭পৃঃ)*

পক্ষান্তরে সবচেয়ে বড় খুশী যা, তা রয়েছে পরকালে; যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হবে যাঁর জন্য রোযাদার রোযা রেখে থাকে। যখন তিনি তাকে রোযার সুপারিশের দরুন 'রাইয়ান' বেহেশ্তে স্থান দিয়ে বৃহৎ প্রতিদান দিবেন।

২৭। রোযা রোযাদারের ঈমান বৃদ্ধি করে। এই রোযাতে মানুষ অধিকাধিক নামায পড়ে, কুরআন তেলাঅত ও যিক্র করে, দান-খয়রাত করে, দুআ ও ইস্তিগফার তথা তওবা করে, ওয়ায-নসীহত শোনে। রোযা তাকে মন্দ কাজ করতে বাধা দেয়। বলা বাহুল্য, এ সবে পাপ বন্ধ থাকে এবং ঈমান বর্ধিত হয়। *(ঐ ৪৫পৃঃ)*

৩০। রোযার মাধ্যমে মুসলিমদের সামাজিক উপকারিতা সাধন

হয়ে থাকে। রোযা হল মুসলিম জাতির ঐক্যের নিদর্শন, সারা উম্মাহর মাঝে সংহতির প্রতীক, গরীব-ধনীর মাঝে সাম্য ও সম্প্রীতির চিহ্ন। এতে আম-খাস, আতরাফ-আশরাফ, আমীর-ফকীরের ভেদাভেদ চূর্ণ হয়ে যায়। সকলের মনে একটাই বোধ জাগে যে, মুসলিম জাতি হল এক জাতি। সকলে একই সময়ে পানাহার করে, একই সময়ে রোযা রাখে। একই জামাআতে মসজিদে তারাবীহর নামায পড়ে। যেন সকলের হৃদয় এক, মাস এক, কর্মও এক, যাদেরকে তাদের নবী ﷺ বলেছেন, তারা হল একটি দেহের মত।

রমযান মাসকে কি দিয়ে স্বাগত জানাব?

রমযান এমন একটি মাস, যার রয়েছে এত এত বৈশিষ্ট্য, এত এত মাহাত্ম্য। এই মাসকে আমরা কি দিয়ে বরণ করব? কোন্ জিনিস দিয়ে তাকে 'খোশ আমদেদ' জানাব?

এই পবিত্র মাসকে স্বাগত জানাতে দুই রকম দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে;

প্রথম প্রকার মানুষ হল তারা; যারা এ মাস নিয়ে খুশী হয়, এর আগমনে আনন্দবোধ করে। তার কারণ, তারা এ মাসে রোযা রাখতে অভ্যাসী। এ মাসের সকল কষ্ট বরণ করতে প্রয়াসী। কারণ, তারা জানে যে, ইহকালের সুখ-সম্ভোগ বর্জন করলে, তা পরকালে

পাওয়া যায়। কারণ, তারা উপলব্ধি করে যে, এ মাস হল আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের এবং তাঁর নৈকট্যদাতা আমলে প্রতিযোগিতা করার বিশাল মৌসম। তারা জানে যে, আল্লাহ্ আযযা অজাল্ল্ এ মাসে যে সওয়াব বান্দাকে প্রদান করবেন, তা আর অন্য কোন মাসে করবেন না। সুতরাং প্রিয় যেমন তার প্রবাসী প্রিয়তম বা তদপেক্ষা প্রিয়তর কিছুর আগমনে আনন্দ পায়, ঠিক তারই মত রমযানের আগমনে তাদের আনন্দিত হওয়াতে আশ্চর্যের কিছু নয়। এই হল প্রথম শ্রেণীর মানুষ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হল তারা, যারা এই পবিত্র মাসকে ভারী মনে করে, রোযার কষ্টকে বড় মনে করে। সুতরাং যখনই এ মাসের আগমন ঘটে, তখনই সে মনে করে তার ঘরে যেন এক অবাঞ্ছিত মেহেমান এল। ফলে শুরু থেকেই সে তার ঘন্টা, দিন ও রাত গুনতে থাকে। অধৈর্য হয়ে তার বিদায় মুহূর্তের অপেক্ষা করতে থাকে। এক একটা দিন পার হতেই তার আনন্দ হয়। পরিশেষে যখন ঈদ আসার সময় হয়, তখন এই মাস অতিবাহিত হওয়া নিকটবর্তী জেনে বড্ড খুশী হয়!

এই শ্রেণীর মানুষরা এই মহতিপূর্ণ মাসকে এই জন্য ভারী মনে করে এবং তাড়াতাড়ি অতিবাহিত হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে যে, তারা তাদের অবৈধ ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়া ছাড়াও পানাহার ও যৌনাচার ইত্যাদি সুখ-সম্ভোগে অধিকাধিক অভ্যাসী থাকে। আর সেই ভোগ-বিলাস ব্যবহার করার পথে এই মাস তাদের জন্য বাধা ও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এ মাস তাদের সুখ-

উপভোগের প্রতিবন্ধক হিসাবে আগমন করে। যার ফলে তারা এই মাসকে প্রচন্ড ভারী বোধ করে থাকে।

আরো একটা কারণ এই যে, তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে বড় অমনোযোগী। এমন কি তাদের মধ্যে অনেকে ফরয ও ওয়াজেব আমলেও ঔদাস্য প্রদর্শন করে থাকে; যেমন তারা নামায পড়ে না। অতঃপর এই মাস প্রবেশ করলে কোন কোন আমল তারা করতে শুরু করে দেয়। কিন্তু আসলে তারা ঐ আমলে অভ্যাসী নয়। যার ফলে রমযান মাসটিকেই ভারী মনে করে থাকে। *(দুরাঃ ৬-৮পৃঃ)*

বলা বাহুল্য, আল্লাহর নেক বান্দার জন্য উচিত, এই পবিত্র মাসকে সত্য ও খাঁটি তওবা দিয়ে; পাপ বর্জন করে এবং পুনরায় সে পাপ না করার পাক্কা সংকল্প নিয়ে খোশ-আমদেদ জানানো।

আর তৃতীয় আর এক শ্রেণীর মানুষ হল, যাদের নিকট রমযানের দিনগুলি বছরের অন্যান্য মাসের দিনসমূহের মতই অতিবাহত হয়ে যায়। তারা ফরয নামায পড়ে, কিন্তু নফল, তারাবীহ, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, কুরআন তিলাঅত ইত্যাদিতে যত্নবান হয় না। তারা এহেন মাসেও বিস্মৃত ও উদাসীন থাকে।

রমযানের রোযার মান

রমযানের রোযা আল্লাহর কিতাব, তাঁর রসূল ﷺ-এর হাদীস ও মুসলিম উম্মাহর ইজমা’ (সর্বসম্মতি) মতে চিরকালের জন্য ফরয।

কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার। তা নির্ধারিত কয়েক দিন---।" *(কুঃ ২/ ১৮৩- ১৮৪)*

তিনি আরো বলেন, "রমযান মাস; যে মাসে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে।" *(কুঃ ২/ ১৮৫)*

হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, "ইসলামের ভিত্তি হল ৫টি কর্ম; আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্যিকারে উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রসূল (দূত) -এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া, নামায কায়েম করা, যাকাৎ প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা এবং সামর্থ্য থাকলে কা'বাগৃহের হজ্জ করা।" *(বুঃ ৮, মুঃ ১৬নং, তিঃ, নাঃ)*

হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رضي الله عنه বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার উপর আল্লাহ কি কি রোযা ফরয করেছেন তা আমাকে বলে দিন।' উত্তরে তিনি বললেন, "রমযান মাসের রোযা।" লোকটি বলল, 'এ ছাড়া অন্য কিছু কি আমার কর্তব্য আছে?' তিনি বললেন, "না, তবে যদি তুমি নফল রোযা রাখ, তাহলে ভিন্ন কথা।" *(বুঃ, ১৮৯১, মুঃ)*

আর মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে একমত যে, রমযানের রোযা ফরয। তা ইসলামের অন্যতম রুক্ন, খুঁটি বা ভিত্তি। এ ফরয হওয়ার কথা সহজ উপায়ে সকলের জানা। সুতরাং যে কেউ তা

অস্বীকার করবে সে মুরতাদ্দ্ কাফের। তাকে তওবা করার জন্য আহবান করা হবে। তাতে সে তওবা করলে এবং রোযা ফরয বলে মেনে নিলে উত্তম। নচেৎ, (সরকার) তাকে কাফের অবস্থায় হত্যা করবে। *(ফিসুঃ ১/৩৮৩, ফুসূল ৪-৫পৃঃ)*

বিনা ওযরে রোযা ত্যাগ করার সাজা

যে ব্যক্তি বিনা ওজরে রমযানের রোযা ত্যাগ করে সে ব্যক্তির দুটি কারণ হতে পারে; হয় সে তা ফরয বলে অস্বীকার করছে এবং তাকে একটি ইবাদত বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে না, (নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক।) আর না হয় সে আলসেমি করে তা রাখছে না।

সুতরাং যদি সে রোযা ফরয বলে অস্বীকার করে ও বলে যে, রোযা শরীয়তে ফরয নয়, তাহলে সে কাফের ও মুরতাদ্দ; যেমন এ কথা পূর্বে বলা হয়েছে। কারণ, সে দ্বীনের সর্ববাদিসম্মত এমন একটি ব্যাপারকে অস্বীকার করে যা আম-খাস সকলের পক্ষে জানা সহজ এবং যা ইসলামের একটি রুক্ন।

আর তার এই মুরতাদ্দ্ হওয়ার ফলে একজন মুরতাদ্দের মাল ও পরিবারের ব্যাপারে যা বিধান আছে তা কার্যকর হবে। সরকারের কাছে সে হত্যাযোগ্য অপরাধী বলে গণ্য হবে। তার গোসল-কাফন ও জানাযা হবে না এবং মুসলিমদের গোরস্থানে তাকে দাফন করাও যাবে না। অবশ্য যদি কেউ নওমুসলিম হওয়ার ফলে অথবা ইসলামী পরিবেশ ও উলামা থেকে দূরে থাকার ফলে এ ধরনের কথা

বলে থাকে, তাহলে তার কথা ভিন্ন।

পক্ষান্তরে যদি কেউ আলসেমি করে রোযা না রাখে, তাহলে ভয়ানক কঠিন শাস্তি তার জন্য অপেক্ষা করছে।

হযরত আবূ উমামাহ বাহেলী ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম; এমন সময় (স্বপ্নে) আমার নিকট দুই ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তাঁরা আমার উভয় বাহুর ঊর্ধ্বাংশে ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের নিকট উপস্থিত করলেন এবং বললেন, 'আপনি এই পাহাড়ে চড়ুন।' আমি বললাম, 'এ পাহাড়ে চড়তে আমি অক্ষম।' তাঁরা বললেন, 'আমরা আপনার জন্য চড়া সহজ করে দেব।' সুতরাং আমি চড়ে গেলাম। অবশেষে যখন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেশ কিছু চিৎকার-ধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'এ চিৎকার-ধ্বনি কাদের?' তাঁরা বললেন, 'এ হল জাহান্নামবাসীদের চীৎকার-ধ্বনি।' পুনরায় তাঁরা আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলাম একদল লোক তাদের পায়ের গোড়ালির উপর মোটা শিরায় (বাঁধা অবস্থায়) লটকানো আছে, তাদের কশগুলো কেটে ও ছিঁড়ে আছে এবং কশ বেয়ে রক্তও ঝরছে। নবী ﷺ বলেন, আমি বললাম, 'ওরা কারা?' তাঁরা বললেন, 'ওরা হল তারা; যারা সময় হওয়ার পূর্বে-পূর্বেই ইফতার করে নিত---।" *(ইখুঃ, ইহিঃ, বাঃ ৪/২১৬, হাঃ ১/৪৩০, সতাঃ ৯৯১নং)*

'ওরা হল তারা; যারা সময় হওয়ার পূর্বে-পূর্বেই ইফতার করে নিত---।' রোযা রাখার পরেও তাদের যদি ঐ অবস্থা হয়, তাহলে

যারা পূর্ণ দিন মূলেই রোযা রাখে না, তাদের অবস্থা এবং যারা পূর্ণ মাসই রোযা রাখে না, তাদের অবস্থা যে কত করুণ, কত সঙ্গিন তা অনুমেয়!

মুস্তাফা মুহাম্মাদ আম্মারাহ তাঁর তারগীবের টীকায় *(২/১০৯)* বলেন, 'উক্ত হাদীসের ভাবার্থ এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে রোযা ভঙ্গকারীদের আযাব সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল করেছেন। তিনি দেখেছেন, তাদের সেই দুরবস্থা; তাদের আকার-আকৃতি ছিল বড় মর্মান্তিক ও নিকৃষ্ট। কঠিন যন্ত্রণায় তারা কুকুর ও নেকড়ের মত চিৎকার করছে। তারা সাহায্য প্রার্থনা করছে অথচ কোন সাহায্যকারী নেই। তাদের পায়ের শেষ প্রান্তে (গোড়ালির উপর মোটা শিরায়) জাহান্নামের আঁকুশি দিয়ে কসাইখানার যবাই করা ছাগলের মত তাদেরকে নিম্নমুখে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর তাদের কশ বেয়ে মুখভর্তি রক্ত ঝরছে! আশা করি নাফরমান বেরোযাদার মুসলিম সম্প্রদায় এই আযাবের কথা জেনে আল্লাহর নিকট তওবা করবে এবং তাঁর সেই আযাবকে ভয় করে যথানিয়মে রোযা পালন করবে।'

ইমাম যাহাবী (রঃ) বলেন, 'মুমিনদের নিকটে এ কথা স্থির-সিদ্ধান্ত যে, যে ব্যক্তি কোন রোগ ও ওজর না থাকা সত্ত্বেও রমযানের রোযা ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি একজন ব্যভিচারী ও মদ্যপায়ী থেকেও নিকৃষ্ট। বরং মুসলিমরা তার ইসলামে সন্দেহ পোষণ করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন নাস্তিক ও নৈতিক শৈথিল্যপূর্ণ মানুষ। *(মাফাঃ ২৫/২২৫, কাঃ ৪৯পৃঃ, ফিসুঃ ১/৩৮৪, ফারারাঃ ২০-২১পৃঃ, তাফাসাসাঃ ৭৪পৃঃ)*

রোযার বিভিন্ন আদব

রোযার হল দুটি রুকন্; যদ্দ্বারা তার প্রকৃতত্ব সংগঠিত ঃ-

১। ফজর উদয় হওয়ার পর থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময় ধরে যাবতীয় রোযা নষ্টকারী জিনিস থেকে বিরত থাকা।

২। নিয়ত ; আর তা হল, মহান আল্লাহর আদেশ পালন করার উদ্দেশ্যে রোযা রাখার জন্য হৃদয়ের সংকল্প।

নিয়ত ফজরের পূর্বে হওয়া জরুরী। তবে রাত্রের যে কোন অংশে করলে যথেষ্ট ও বৈধ। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রাত থেকে রোযা রাখার সংকল্প না করে, তার রোযা নেই।" *(নাঃ, সজাঃ ৬৫৩৫নং)* তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে রোযা রাখার সংকল্প না করে, তার রোযা নেই।" *(দারাঃ, বাঃ, আয়েশা কর্তৃক এবং আঃ, আদাঃ, তিঃ, নাঃ হাফসা কর্তৃক, ইগঃ ৯১৪নং)*

প্রকাশ থাকে যে, নিয়ত করা জরুরী, কিন্তু পড়া বিদআত।

রোযায় রোযাদারের নিম্নলিখিত আদবের খেয়াল রাখা উচিত ঃ-

সেহরী বা সাহারী খাওয়া

মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে রোযার জন্য সেহরী খাওয়া মুস্তাহাব এবং যে ব্যক্তি তা ইচ্ছাকৃত খায় না সে গোনাহগার নয়। আর এ কারণেই যদি কেউ ফজরের পর জাগে এবং সেহরী খাওয়ার সময় না পায়, তাহলে তার জন্য জরুরী রোযা রেখে নেওয়া। এতে

তার রোযার কোন ক্ষতি হবে না। বরং ক্ষতি হবে তখন, যখন সে কিছু খেতে হয় মনে করে তখনই (ফজরের পর) কিছু খেয়ে ফেলবে। সে ক্ষেত্রে তাকে সারা দিন পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে এবং রমযানের পরে সেই দিনটিকে কাযা করতে হবে।

সেহরী খাওয়া যে উত্তম তা প্রকাশ করার জন্য মহানবী ﷺ উম্মতকে বিভিন্ন কথার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি সেহরীকে বর্কতময় খাদ্য বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা সেহরী খাও। কারণ, সেহরীতে বর্কত আছে।" *(বুঃ ১৮২৩, মুঃ ১০৯৫নং)* "তোমরা সেহরী খেতে অভ্যাসী হও। কারণ, সেহরীই হল বর্কতময় খাদ্য।" *(আঃ, নাঃ সজাঃ ৪০৮১নং)*

ইরবায বিন সারিয়াহ বলেন, একদা রমযানে আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে সেহরী খেতে ডাকলেন; বললেন, "বর্কতময় খানার দিকে এস।" *(আঃ, আদাঃ, নাঃ, ইহিঃ, ইখুঃ, সজাঃ ৭০৪৩নং)*

সেহরীতে বর্কত থাকার মানে হল, সেহরী রোযাদারকে সবল রাখে এবং রোযার কষ্ট তার জন্য হাল্কা করে। আর এটা হল শারীরিক বর্কত। পক্ষান্তরে শরয়ী বর্কত হল, রসূল ﷺ-এর আদেশ পালন এবং তাঁর অনুসরণ।

মহানবী ﷺ এই সেহরীর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তা দিয়ে মুসলিম ও আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের) রোযার মাঝে পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন। তিনি অন্যান্য ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করার মত তাতেও বিরোধিতা করতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন, "আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবের

রোযার মাঝে পার্থক্য হল সেহরী খাওয়া।” *(মুঃ ১০৯৬, আদাঃ ২৩৪৩, ফাসিঃ মুসনিদ ৯৮-পৃঃ)*

v কি খেলে সেহরী খাওয়া হবে?

অল্প-বিস্তর যে কোন খাবার খেলেই সেহরী খাওয়ার বিধি পালিত হয়ে যাবে। এমনকি কেউ যদি এক ঢোক দুধ, চা অথবা পানিও খায় অথবা ২/১টি বিস্কুট বা খেজুরও খায়, তাহলে তারও সেহরী খাওয়ার সুন্নত পালন হয়ে যাবে। আর এই সামান্য পরিমাণ খাবারেই রোযাদার এই বিরাট ফরয রোযা পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে বল পাবে এবং ফিরিশ্তাবর্গ তার জন্য দুআ করবে।

আবূ সাঈদ খুদরী ﷛ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “সেহরী খাওয়াতে বর্কত আছে। সুতরাং তোমরা তা খেতে ছেড়ো না; যদিও তাতে তোমরা এক ঢোক পানিও খাও। কেননা, যারা সেহরী খায় তাদের জন্য আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্তা দুআ করতে থাকেন।” *(আঃ, সজাঃ ৩৬৮৩নং)*

তিনি আরো বলেন, “তোমরা সেহরী খাও; যদিও এক ঢোক পানি হয়।” *(আঃ, ইহিঃ প্রমুখ, সজাঃ ২৯৪৫নং)*

আবূ হুরাইরা ﷛ কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী ﷺ বলেন, “মুমিনের শ্রেষ্ঠ সেহরী হল খেজুর।” *(আদাঃ ২৩৪৫ নং, ইহিঃ, বাঃ ৪/২৩৬-২৩৭, সিসঃ ৫৬২নং)*

অবশ্য সেহরী খাওয়াতে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। কারণ, বেশী পানাহার করার ফলে ইবাদত ও আনুগত্যে আলস্য সৃষ্টি হয়।

V সেহরীর সময়ঃ

সেহরী খাওয়ার সময় হল অর্ধরাত্রির পর থেকে ফজরের আগে পর্যন্ত। আর মুস্তাহাব হল, ফজর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না হলে শেষ সময়ে সেহরী খাওয়া। আনাস ؓ কর্তৃক বর্ণিত, যায়দ বিন ষাবেত তাঁকে জানিয়েছেন যে, তাঁরা নবী ﷺ-এর সাথে সেহরী খেয়ে (ফজরের) নামায পড়তে উঠে গেছেন। আনাস বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'সেহরী খাওয়া ও আযান হওয়ার মধ্যে কতটুকু সময় ছিল?' উত্তরে যায়দ বললেন, 'পঞ্চাশ অথবা ষাটটি আয়াত পড়তে যতটুকু লাগে।' *(বুঃ ৫৭৫, ১৯২১, মুঃ ১০৯৭, তিঃ ৭০৩নং)*

মহানবী ﷺ-এর সাহাবাগণ খুব তাড়াতাড়ি (সময় হওয়া মাত্র) ইফতার করতেন এবং খুব দেরী করে সেহরী খেতেন। *(বাঃ ৪/২৩৮, ইআশাঃ ৮৯৩২নং)*

সুতরাং সেহরী আগে আগে খেয়ে ফেলা উচিত নয়। মধ্য রাতে সেহরী খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া তো মোটেই উচিত নয়। কারণ, তাতে ফজরের নামায ছুটে যায়। ঘুমিয়ে থেকে হয় তার জামাআত ছুটে যায়। নচেৎ, নামাযের সময় চলে গিয়ে সূর্য উঠার পর চেতন হলে নামাযটাই কাযা হয়ে যায়। নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক। আর নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় মসীবত; যাতে বহু রোযাদার ফেঁসে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত করুন। আমীন।

আর এ কথা ভুলার নয় যে, আগে-ভাগে সেহরী খাওয়ার ফলে আল্লাহর আহবানের সাড়া দেওয়ার চমৎকার অনুভূতি থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে যাই। যখন মুআয্যিন 'আল্লাহু আকবার' বলে ফজরের আযান দেয়, তখন আমাদের হাত ও মুখ সেই আহবানে সাড়া দিয়ে পানাহার থেকে বিরত হয়ে যায়।

ইফতার

v শীঘ্র ইফতার ঃ

রোযার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে রোযা খোলা বা ইফতার করার জন্য প্রত্যেক রোযাদারের অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করাটাই স্বাভাবিক। আর সেই সময় যে তার রোযা পূর্ণ করতে পারে প্রকৃতিগতভাবে সে খুশী হয়। অতএব ইফতার করতে তাড়াতাড়ি করাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও দয়ার নবী ﷺ আমাদেরকে সত্বর ইফতার করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, তাতে আমাদের মঙ্গল আছে। তিনি বলেন, “লোকেরা ততক্ষণ মঙ্গলে থাকবে, যতক্ষণ তারা (সূর্য ডোবার পর নামাযের আগে) ইফতার করতে তাড়াতাড়ি করবে।” *(বুঃ ১৯৫৭, মুঃ ১০৯৮নং)*

যেহেতু ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানরা রোযা রেখে দেরী করে ইফতার করে, তাই তিনি আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, “দ্বীন ততকাল বিজয়ী থাকবে, যতকাল লোকেরা ইফতার করতে তাড়াতাড়ি করবে। কারণ, ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানরা দেরী করে ইফতার করে।” *(আদাঃ, হাঃ, ইহিঃ, সজাঃ ৭৬৮৯নং)*

খোদ মহানবী ﷺ-এর আমল ছিল জলদি ইফতার করা। আবূ আত্বিয়াহ বলেন, আমি ও মাসরূক আয়েশা (রাঃ)এর নিকট

উপস্থিত হয়ে বললাম, 'হে উম্মুল মুমেনীন! মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে একজন (সময় হওয়া মাত্র) তাড়াতাড়ি ইফতার করে ও তাড়াতাড়ি নামায পড়ে এবং অপর একজন দেরী করে ইফতার করে ও দেরী করে নামায পড়ে।' তিনি বললেন, 'ওদের মধ্যে কে তাড়াতাড়ি ইফতার করে ও তাড়াতাড়ি নামায পড়ে?' আমরা বললাম, 'আব্দুল্লাহ (অর্থাৎ ইবনে মাসঊদ)।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ এ রকমই (তাড়াতাড়ি ইফতার ও নামায আদায়) করতেন।' *(মুঃ ১০৯৯নং)*

সময় হওয়ার সাথে সাথে শীঘ্র ইফতার করা নবুঅতের একটি আদর্শ। মহানবী ﷺ বলেন, "তিনটি কাজ নবুয়তের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত; জলদি ইফতার করা, দেরী করে (শেষ সময়ে) সেহরী খাওয়া এবং নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা।" *(ত্বাবঃ, মাযাঃ ২/ ১০৫, সজাঃ ৩০৩৮-নং)*

v কি দিয়ে ইফতারী হবে?

কিছু আধা-পাকা অথবা পূর্ণ পাকা (শুষ্ক) খেজুর দিয়ে এবং তা না পাওয়া গেলে পানি দিয়ে ইফতার করা সুন্নত।

আনাস ؓ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ নামাযের পূর্বে কিছু আধা-পাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তা না পেলে পূর্ণ পাকা (শুকনা) খেজুর দিয়ে এবং তাও না পেলে কয়েক ঢোক পানি খেয়ে নিতেন।' *(আঃ ৩/ ১৬৪, আদাঃ ২৩৫৬, তিঃ ৬৯৬, ইমাঃ ২০৬৫, দারাঃ ২৪০, হাঃ ১/ ৪৩২, বাঃ ৪/২৩৯, ইগঃ ৯২২নং)*

ইফতার করার সময় খাওয়ার মত কোন জিনিস না পাওয়া গেলে

মনে মনে ইফতারের নিয়ত করাই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে আঙ্গুল চোষার প্রয়োজন নেই - যেমন কিছু সাধারণ লোক করে থাকে। যেমন রুমালকে থুথু দিয়ে ভিজিয়ে তা চোষাও বিধেয় নয়।

উল্লেখযোগ্য যে, কিছু লোক আছে যারা ইফতারী করতে বসে এমন পেটুকের মত খেতে শুরু করে যে, দেখে মনে হয়, সে কয়েক দিন ধরে খেতে পায়নি! আর খেতে খেতে মাগরিবের নামাযের জামাআত নষ্ট করে ফেলে অথবা তার নামাযের তকবীরে তাহরীমা বা কিছু অংশ ছুটে যায়।

রোযা অবস্থায় দুআ

রোযাদারের উচিত, ইফতার করার আগে পর্যন্ত রোযা থাকা অবস্থায় বেশী বেশী করে দুআ করা। কারণ, রোযা থাকা অবস্থায় রোযাদারের দুআ আল্লাহর নিকট মঞ্জুর হয়। মহানবী ﷺ বলেন, “তিন ব্যক্তির দুআ অগ্রাহ্য করা হয় না (বরং কবুল করা হয়); পিতার দুআ, রোযাদারের দুআ এবং মুসাফিরের দুআ।” *(বাঃ ৩/৩৪৫, প্রমুখ, সিসঃ ১৭৯৭নং)*

পক্ষান্তরে ইফতার করার সময় দুআ কবুল হওয়ার কথা বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ ব্যাপারে যা কিছু বর্ণনা করা হয়, তা যয়ীফ। অনুরূপ ইফতারের সময় একাকী বা জামাআতী হাত তুলে দুআও বিধেয় নয়। কারণ, সুন্নাহ (মহানবী ﷺ বা তাঁর সাহাবাগণের তরীকায়) এ আমলের বর্ণনা মিলে না। আর ইফতার করার সময়

যে দুআ প্রমাণিত, তা ইফতার করার পর পঠনীয়। ইবনে উমার ﵄ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ ইফতার করলে এই দুআ বলতেন,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

উচ্চারণঃ- যাহাবায যামা-উ অবতাল্লাতিল উরুকু অযাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ।

অর্থ- পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা সতেজ হল এবং ইনশা-আল্লাহ সওয়াব সাব্যস্ত হল। *(আদাঃ ২৩৫৭, সআদাঃ ২০৬৬নং)*

রোযা অবস্থায় যা বৈধ

কিছু কাজ আছে, যা রোযা অবস্থায় করা বৈধ নয় বলে অনেকের মনে হতে পারে, অথচ তা রোযাদারের জন্য করা বৈধ। সেই ধরনের কিছু কাজের কথা নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ-

১। পানিতে নামা, ডুব দেওয়া ও সাঁতার কাটা ঃ

রোযাদারের জন্য পানিতে নামা, ডুব দেওয়া ও সাঁতার কাটা, একাধিক বার গোসল করা, এসির হাওয়াতে বসা এবং কাপড় ভিজিয়ে গায়ে-মাথায় জড়ানো বৈধ। যেমন পিপাসা ও গরমের তাড়নায় মাথায় পানি ঢালা, বরফ বা আইসক্রিম চাপানো দোষাবহ নয়। *(ফুসিতাযাঃ ১৬পৃঃ, তাইরাঃ ৪৬পৃঃ, ফইঃ ২/১৩০, ফাসিঃ ৪৭পৃঃ, ৭০ঃ ৫৮নং)*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রোযা রেখে নবী ﷺ-এর অপবিত্র অবস্থায় ফজর হত। অতঃপর তিনি গোসল করতেন। *(বুঃ ১৯২৫, মুঃ ১১০৯নং)*

আবূ বাক্‌র বিন আব্দুর রহমান নবী ﷺ-এর কিছু সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সাহাবী) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দেখেছি, তিনি রোযা রেখে পিপাসা অথবা গরমের কারণে নিজ মাথায় পানি ঢেলেছেন। *(আঃ ৩/৪৭৫, আদাঃ ২৩৬৫নং, মাঃ)*

২। মিসওয়াক বা দাঁতন করা।

দাঁতন করা রোযাদার-অরোযাদার সকলের জন্য এবং দিনের শুরু ও শেষ ভাগে সব সময়কার জন্য সুন্নত। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ-এর নির্দেশ ব্যাপক; তিনি বলেন, "দাঁতন করায় রয়েছে মুখের পবিত্রতা এবং প্রতিপালক আল্লাহর সন্তুষ্টি। *(আঃ ৬/৪৭, দাঃ, নাঃ ৫নং, ইখুঃ, বাঃ ১/৩৪, ইহিঃ, বুঃ (বিনা সনদে), মিঃ ৩৮১, ইগঃ ৬৬নং)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "আমি উম্মতের জন্য কষ্টকর না জানলে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় দাঁতন করতে আদেশ দিতাম।" *(বুঃ ৮৮৭, মুঃ ২৫২, সুআঃ)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, "---তাদেরকে প্রত্যেক ওযূর সময় দাঁতন করতে আদেশ দিতাম।" *(আঃ ২/৪৬০, ৫১৭, প্রমুখ)*

ইমাম ত্বাবারানী উত্তম সনদ দ্বারা বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুর রহমান বিন গুন্‌ম বলেন, আমি মুআয বিন জাবাল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি কি রোযা অবস্থায় দাঁতন করব?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' আমি বললাম, 'দিনের কোন্‌ ভাগে?' তিনি বললেন, 'সকাল অথবা বিকালে।' আমি বললাম, 'লোকে তো রোযার বিকালে দাঁতন করাকে অপছন্দনীয় মনে করে। তারা বলে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ

আল্লাহর নিকট কস্তুরীর সুবাস অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধময়।” মুআয ﷺ বললেন, ‘সুবহানাল্লাহ! তিনি তাদেরকে দাঁতন করতে আদেশ দিয়েছেন। আর যে জিনিস তিনি পরিষ্কার করতে আদেশ দিয়েছেন, সে জিনিসকে ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্গন্ধময় করা উত্তম হতে পারে না। তাতে কোন প্রকারের মঙ্গল নেই; বরং তাতে অমঙ্গলই আছে।’ *(দ্রঃ ইগঃ ১/ ১০৬)*

কিন্তু যদি কোন দাঁতনে বিশেষ স্বাদ থাকে এবং তা তার থুথুকে প্রভাবান্বিত করে, তাহলে তার স্বাদ বা থুথু গিলে নেওয়া উচিত নয়। *(ইবনে উষাইমীন, ফাসিঃ মুসনিদ ৩৯পৃঃ)* পরন্তু সেই দাঁতন করা থেকে দূরে থাকা উচিত, যার দ্রবণশীল উপাদান (ও রস) আছে। যেমন কাঁচা (গাছের ডালের বা শিকড়ের) দাঁতন। তদনুরূপ সেই দাঁতন, যাতে তার নিজস্ব স্বাদ ছাড়া ভিন্ন স্বাদ; যেমন লেবু বা পুদীনা (পেপারমেন্ট, মেনথল) ইত্যাদির স্বাদ অতিরিক্ত করা হয়েছে এবং যা মুখের ভিতরে গিয়ে দ্রবীভূত হয়ে মুখগহ্বরে ছড়িয়ে পড়ে। আর ইচ্ছা করে তা গিলে ফেলা বৈধ নয়। তবে যদি অনিচ্ছাকৃত কারো গিলা যায়, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি হয় না। *(৭০ঃ ৫৪নং)*

৩। সুরমা লাগানো এবং চোখে ও কানে ওষুধ ব্যবহার

রোযা অবস্থায় সুরমা লাগানো এবং চোখে ও কানে ওষুধ ব্যবহার বৈধ। কিন্তু ব্যবহার করার পর যদি গলায় সুরমা বা ওষুধের স্বাদ অনুভূত হয়, তাহলে (কিছু উলামার মতে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং সে রোযা) কাযা রেখে নেওয়াই হল পূর্বসতর্কতামূলক কর্ম। *(ইবনে বায, ফামুতাসিঃ ২৮পৃঃ)* কারণ, চোখ ও কান খাদ্য ও পানীয় পেটে

যাওয়ার পথ নয় এবং সুরমা বা ওষুধ লাগানোকে খাওয়া বা পান করাও বলা যায় না; না সাধারণ প্রচলিত কথায় এবং না-ই শরয়ী পরিভাষায়। অবশ্য রোযাদার যদি চোখে বা কানে ওষুধ দিনে ব্যবহার না করে রাতে করে, তাহলে সেটাই হবে পূর্বসাবধানতামূলক কর্ম। *(মুমঃ ৬/৩৮২, সঊদী স্থায়ী উলামা কমিটি, ফাসিঃ মুসনিদ ৪৪পৃঃ, ফইঃ ২/১২৯)*

হযরত আনাস ﷺ রোযা থাকা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন। *(সআদাঃ ২০৮২নং)*

৬। বাহ্যিক শরীরে তেল, মলম, পাওডার বা ক্রিম ব্যবহারঃ

বাহ্যিক শরীরের চামড়ায় পাওডার বা মলম ব্যবহার করা রোযাদারের জন্য বৈধ। কারণ, তা পেটে পৌঁছে না।

তদনুরূপ প্রয়োজনে ত্বককে নরম রাখার জন্য কোন তেল, ভ্যাসলিন বা ক্রিম ব্যবহার করাও রোযা অবস্থায় অবৈধ নয়। কারণ, এ সব কিছু কেবল চামড়ার বাহিরের অংশ নরম করে থাকে এবং শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে না। পরন্তু যদিও লোমকূপে তা প্রবেশ হওয়ার কথা ধরেই নেওয়া যায়, তবুও তাতে রোযা নষ্ট হবে না। *(ইবনে জিবরীন, ফইঃ ২/১২৭, ফাসিঃ মুসনিদ ৪১পৃঃ)*

তদনুরূপ রোযা অবস্থায় মহিলাদের জন্য হাতে মেহেন্দী, পায়ে আলতা অথবা চুলে (কালো ছাড়া অন্য রঙের) কলফ ব্যবহার বৈধ। এ সবে রোযা বা রোযাদারের উপর কোন (মন্দ) প্রভাব ফেলে না। *(ফাসিঃ মুসনিদ ৪৫পৃঃ, ফইঃ ২/১২৭)*

৭। স্বামী-স্ত্রীর আপোষের চুম্বন ও প্রেমকেলি ঃ

যে রোযাদার স্বামী-স্ত্রী মিলনে ধৈর্য রাখতে পারে; অর্থাৎ সঙ্গম বা বীর্যপাত ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা না করে, তাদের জন্য আপোসে চুম্বন ও প্রেমকেলি বা কোলাকুলি করা বৈধ এবং তা তাদের জন্য মকরূহ নয়। কারণ, মহানবী ﷺ রোযা রাখা অবস্থায় স্ত্রী-চুম্বন করতেন এবং রোযা অবস্থায় প্রেমকেলিও করতেন। আর তিনি ছিলেন যৌন ব্যাপারে বড় সংযমী। *(বুঃ ১৯২৭, মুঃ ১১০৬, আদাঃ ২৩৮২, তিঃ ৭২৯, ইআশাঃ ৯৩৯২নং)* অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ স্ত্রী-চুম্বন করতেন রমযানে রোযা রাখা অবস্থায়; *(মুঃ ১১০৬নং)* রোযার মাসে। *(আদাঃ ২৩৮৩, ইআশাঃ ৯৩৯০নং)*

পক্ষান্তরে রোযাদার যদি আশঙ্কা করে যে, প্রেমকেলি বা চুম্বনের ফলে তার বীর্যপাত ঘটে যেতে পারে অথবা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের উত্তেজনার ফলে সহসায় মিলন ঘটে যেতে পারে, কারণ সে সময় সে হয়তো তাদের উদগ্র কাম-লালসাকে সংযত করতে পারবে না, তাহলে সে কাজ তাদের জন্য হারাম। আর তা হারাম এই জন্য যে, যাতে পাপের ছিদ্রপথ বন্ধ থাকে এবং তাদের রোযা নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

১০। রক্ত পরীক্ষা করা ঃ

পরীক্ষার জন্য কিছু রক্ত দেওয়া রোযাদারের জন্য বৈধ। এতে তার রোযার কোন ক্ষতি হয় না। *(রিমুযাসিঃ ২৪পৃঃ, ফাসিঃ মুসনিদ ৫৩পৃঃ, ফামুতাসিঃ ৩৪পৃঃ)*

১১। দাঁত তোলা ঃ

রোযাদারের জন্য দাঁত (স্টোন ইত্যাদি থেকে) পরিষ্কার করা, ডাক্তারী ভরণ (ইনলেই) ব্যবহার করা এবং যন্ত্রণায় দাঁত তুলে ফেলা বৈধ। তবে এ সব ক্ষেত্রে তাকে একান্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, যাতে কোন প্রকার ওষুধ বা রক্ত গিলা না যায়। *(ইবনে বায, ফামুতাসিঃ ২৯পৃঃ)*

১৩। আহারের কাজ দেয় না এমন (ওষুধ) ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা ঃ

রোযাদারের জন্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেই ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা বৈধ, যা পানাহারের কাজ করে না। যেমন, পেনিসিলিন বা ইন্‌সুলিন ইঞ্জেকশন অথবা অ্যান্টিবায়োটিক বা টনিক কিংবা ভিটামিন ইঞ্জেকশন অথবা ভ্যাক্‌সিন ইঞ্জেকশন প্রভৃতি হাতে, কোমরে বা অন্য জায়গায়, দেহের পেশী অথবা শিরায় ব্যবহার করলে রোযার ক্ষতি হয় না। তবুও নিতান্ত জরুরী না হলে তা দিনে ব্যবহার না করে রাত্রে ব্যবহার করাই উত্তম ও পূর্বসাবধানতামূলক কর্ম।

১৬। কুল্লি করা ও নাকে পানি নেওয়া ঃ

রোযাদারের ঠোঁট শুকিয়ে গেলে পানি দ্বারা ভিজিয়ে নেওয়া এবং মুখ বা জিভ শুকিয়ে গেলে কুল্লি করা বৈধ। অবশ্য গড়গড়া করা বৈধ নয়। আর এ ক্ষেত্রে মুখ থেকে পানি বের করে দেওয়ার পর ভিতরে পানির যে আর্দ্রতা বা স্বাদ থেকে যাবে, তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, তা থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। *(ইআইঃ ২৪পৃঃ, ৭০ঃ ৫৩নং)*

১৭। সুগন্ধির সুঘ্রাণ নেওয়াঃ

রোযা রাখা অবস্থায় আতর বা অন্য প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং সর্বপ্রকার সুঘ্রাণ নাকে নেওয়া রোযাদারের জন্য বৈধ। তবে ধুঁয়া জাতীয় সুগন্ধি (যেমন আগরবাতি, চন্দন-ধুঁয়া প্রভৃতি) ইচ্ছাকৃত নাকে নেওয়া বৈধ নয়। কারণ, এই শ্রেণীর সুগন্ধির ঘনত্ব আছে; যা পাকস্থলিতে গিয়ে পৌঁছে। *(দ্রঃ ফইঃ ২/১২৮, ফাসিঃ মুসনিদ ৪৩পৃঃ, তাইরাঃ ৪৭পৃঃ)*

বলা বাহুল্য, রান্নাশালের যে ধুঁয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাকে এসে প্রবেশ করে, তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। কারণ, তা থেকে বাঁচার উপায় নেই। *(ইবনে উষাইমীন, মাফাঃ ১/৫০৮)*

১৮। থুথু ও গয়ের গিলাঃ

থুথু ও গয়ের থেকে বাঁচা দুঃসাধ্য। কারণ, তা মুখে বা গলার গোড়ায় জমা হয়ে নিচে এমনিতেই চলে যায়। অতএব এতে রোযা নষ্ট হবে না এবং বারবার থুথু ফেলারও দরকার হবে না।

অবশ্য যে কফ, গয়ের, খাঁকার বা শ্লেষ্মা বেশী মোটা এবং যা কখনো মানুষের বুক (শ্বাসযন্ত্র) থেকে, আবার কখনো মাথা (Sinuses) থেকে বের হয়ে আসে, তা গলা ঝেড়ে বের করে বাইরে ফেলা ওয়াজেব এবং তা গিলে ফেলা বৈধ নয়। যেহেতু তা ঘৃণিত; সম্ভবতঃ তাতে শরীর থেকে বেরিয়ে আসা কোন রোগজীবাণুও থাকতে পারে। সুতরাং তা গিলে ফেলাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতিও হতে পারে। তবে যদি কেউ ফেলতে না পেরে গিলেই ফেলে, তাহলে তাতে রোযা নষ্ট হবে না।

পক্ষান্তরে মুখের ভিতরকার স্বাভাবিক লালা গিলাতে কোন ক্ষতি নেই। রোযাতেও কোন প্রভাব পড়ে না। *(মুমঃ ৬/৪২৮-৪২৯, ফইঃ ২/১২৫, ফাসিঃ ৩৮পৃঃ)* এই লালা বের করে ফেলা জরুরী নয়; এমনকি ফজরের আযানের সামান্য পূর্বে পানি পান করার পরেও নয়। কারণ, আমাদের জানা মতে সাহাবাবর্গ কর্তৃক এমন কোন নির্দেশ বর্ণিত হয় নি, যাতে বুঝা যায় যে, রোযাদার ফজর উদয় (সেহরীর সময় শেষ) হওয়ার একটু পূর্বে পানি পান করলে ততক্ষণ পর্যন্ত থুথু ফেলতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত জিব থেকে পানির স্বাদ দূরীভূত না হয়েছে। বরং এতটুকু অবশ্যই ক্ষমার্হ। তবে হ্যাঁ, যদি কোন খাবারের স্বাদ; যেমন খেজুর, চা বা অনুরূপ কোন মিষ্টি জাতীয় খাবারের মিষ্টতা জিবে অবশিষ্ট থেকে যায়, তাহলে তা অবশ্যই থুথু ফেলার সাথে (বা পানি দ্বারা কুল্লি করে) দূর করা জরুরী এবং সেহরীর সময় শেষ হয়ে গেছে জানার পর তা গিলা বৈধ নয়।

দাঁতে লেগে থাকা গোশ্ত্ বা অন্য কোন খাবার ফজর উদয় হওয়ার পরে অনিচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেললে, অথবা তা অতি সামান্য হওয়ার ফলে মুখে বুঝতে পারা এবং বের করে ফেলা সম্ভব না হলে তা মুখের স্বাভাবিক লালার মতই। তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু বেশী হলে এবং তা বের করে ফেলা সম্ভব হলে, বের করে দিলে আর কোন ক্ষতি হবে না। পরন্তু তা ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেললে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। *(৭০ঃ ৫৩নং)*

১। লবণ বা মিষ্টি চাখা ঃ

রান্না করতে করতে প্রয়োজনে খাবারের লবণ বা মিষ্টি সঠিক

হয়েছে কি না তা চেখে দেখা রোযাদারের জন্য বৈধ। তদনুরূপ কোন কিছু কেনার সময় চেখে পরীক্ষা করার দরকার হলে তা করতে পারে। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'কোন খাদ্য, সির্কা এবং কোন কিছু কিনতে হলে তা চেখে দেখাতে কোন দোষ নেই।' *(দ্রঃ বুঃ ৩৮০পৃঃ, ইআশাঃ ২/৩০৫, বাঃ ৪/২৬১, ইগঃ ৯৩৭নং)*

অনুরূপভাবে অতি প্রয়োজনে মা তার শিশুর জন্য কোন শক্ত খাবার চিবিয়ে নরম করে দিতে পারে, ধান শুকিয়েছে কি না এবং মুড়ির চাল হয়েছে কি না তা চিবিয়ে দেখতে পারে। অবশ্য এ সকল ক্ষেত্রে শর্ত হল, যেন চর্বিত কোন অংশ রোযাদারের পেটে না চলে যায়। বরং অতি সাবধানতার সাথে কেবল দাঁতে চিবিয়ে এবং জিভে তার স্বাদ চেখে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ফেলা জরুরী। *(ফইঃ ২/১২৮, ৭০ঃ ৫৩নং, সারাঃ ২৬পৃঃ, ফিসুঃ ১/৪০৯)*

অন্যান্য মাসায়েল ঃ

স্ত্রী-সঙ্গম অথবা স্বপ্নদোষ হওয়ার পরেও সময় অভাবে গোসল না করে নাপাক অবস্থাতেই রোযাদার রোযার নিয়ত করতে এবং সেহরী খেতে পারে। এমন কি সেহরীর সময় শেষ হয়ে গেলেও আযানের পর গোসল করতে পারে। মা আয়েশা ও উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর (কখনো কখনো) স্ত্রী-মিলন করে অপবিত্র অবস্থায় ফজর হয়ে যেত। তারপর তিনি গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন।' *(বুঃ ১৯২৫, মুঃ ১১০৯, সুআঃ)*

তদনুরূপ নিফাস ও ঋতুমতী মহিলার রাত্রে খুন বন্ধ হলে (রোযার নিয়ত করে এবং সেহরী খেয়ে) ফজরের পর রোযায় থেকে পরে

গোসল করে নামায পড়তে পারে। উপর্যুক্ত নাপাক পুরুষ ও মহিলার জন্য নাপাকীর গোসলকে সকাল বা দুপুরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা বৈধ নয়। বরং সূর্য উদয়ের পূর্বেই গোসল করে যথাসময়ে নামায আদায় করা তাদের জন্য ওয়াজেব। যেমন পুরুষের জন্য ওয়াজেব এমন সময়ের ভিতরে সত্বর গোসল করা, যাতে ফজরের নামায জামাআত সহকারে মসজিদে আদায় করতে সক্ষম হয়। *(ফিসুঃ ১/৪১১, ইবনে বায, ফাসিঃ মুসনিদ ৫১পৃঃ, রিমুযাসিঃ ২৩পৃঃ)*

জ্ঞাতব্য যে, রমযানের দিনের বেলায় রোযাদারের স্বপ্নদোষ হয়ে গেলে তার রোযা বাতিল নয়। কেননা, তা তার এখতিয়ারকৃত নয়। অতএব তার জন্য জরুরী হল, নাপাকীর গোসল করা। অবশ্য ফজরের নামায পড়ার পর ঘুমাতে গিয়ে স্বপ্নদোষ হলে, সঙ্গে সঙ্গে গোসল না করে যদি যোহরের আগে পর্যন্ত বিলম্ব করে গোসল করে, তাহলে তাতে দোষ হবে না। *(ইবনে বায, ফাসিঃ মুসনিদ ৫১ পৃঃ)* অবশ্য উত্তম হল, নাপাকে না থেকে সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে গোসল করে বিভিন্নভাবে আল্লাহর যিক্র করা।

রোযাদারের জন্য দিনে ঘুমানো বৈধ। কিন্তু সকল নামায তার যথাসময়ে জামাআত সহকারে আদায় করতে অবহেলা প্রদর্শন করা বৈধ নয়। যেমন, বিভিন্ন ইবাদতের কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। বরং উচিত হল, ঘুমিয়ে সময় নষ্ট না করে রমযানের সেই মাহাত্ম্যপূর্ণ সময়কে নফল নামায, যিক্র-আযকার ও কুরআন কারীম তেলাঅত দ্বারা আবাদ করা। যাতে তার রোযার ভিতরে নানা প্রকার ইবাদতের সমাবেশ ঘটে। *(ফাসিঃ ৩১-৩২পৃঃ)*

যাতে রোযা নষ্ট ও বাতিল হয়

যে সব কারণে রোযা নষ্ট হয় তা দুই শ্রেণীর; প্রথম শ্রেণীর কারণ রোযা নষ্ট করে এবং তাতে কাযা ওয়াজেব হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণ রোযা নষ্ট করে এবং কাযার সাথে কাফ্ফারাও ওয়াজেব করে।

যে কারণে রোযা নষ্ট হয় এবং কাযার সাথে কাফ্ফারাও ওয়াজেব হয়; তা হল ঃ-

১। স্ত্রী-সঙ্গম ঃ

রোযা অবস্থায় যখনই রোযাদার স্ত্রী-মিলন করবে, তখনই তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং এ মিলন যদি রমযানের দিনে সংঘটিত হয় এবং রোযা রোযাদারের জন্য ফরয হয়, (অর্থাৎ রোযা কাযা করা তার জন্য বৈধ না হয়) তাহলে ঐ মিলনের ফলে যথাক্রমে ৫টি জিনিস সংঘটিত হবে ঃ-

(ক) কাবীরা গোনাহ; আর তার ফলে তাকে তওবা করতে হবে।

(খ) তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে।

(গ) তাকে ঐ দিনের অবশিষ্ট অংশ পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে।

(ঘ) ঐ দিনের রোযা (রমযান পর) কাযা করতে হবে।

(ঙ) বৃহৎ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। আর তা হল, একটি ক্রীতদাসকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে হবে। তাতে সক্ষম না হলে,

লাগাতার (একটানা) দুই মাস রোযা রাখতে হবে। আর তাতে সক্ষম না হলে, ৬০ জন মিসকীনকে খাদ্যদান করতে হবে।

যে মহিলার উপর রোযা ফরয, সেই মহিলা সম্মত হয়ে রমযানের দিনে স্বামী-সঙ্গম করলে তারও উপর কাফ্ফারা ওয়াজেব। অবশ্য তার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও স্বামী যদি তার সাথে জোরপূর্বক সহবাস করতে চায়, তাহলে তার জন্য যথাসাধ্য তা প্রতিহত করা জরুরী। রুখতে না পারলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজেব নয়।

এই জন্যই যে মহিলা জানে যে, তার স্বামীর কামশক্তি বেশী; সে তার কাছে প্রেম-হৃদয়ে কাছাকাছি হলে নিজের যৌন-পিপাসা দমন রাখতে পারে না, সেই মহিলার জন্য উচিত, রমযানের দিনে তার কাছ থেকে দূরে থাকা এবং প্রসাধন ও সাজ-সজ্জা না করা। তদনুরূপ স্বামীর জন্যও উচিত, পদস্খলনের জায়গা থেকে দূরে থাকা এবং রোযা থাকা অবস্থায় স্ত্রীর কাছ না ঘেঁষা; যদি আশঙ্কা হয় যে, উগ্র যৌন-কামনায় সে তার মনকে কাবু রাখতে পারবে না। কারণ, এ কথা বিদিত যে, প্রত্যেক নিষিদ্ধ জিনিসই ঈপ্সিত। *(দ্রঃ মুমঃ ৬/৪১৫, ৭০ঃ ৭০নং, ফারারাঃ ৬১পৃঃ)*

যে জিনিসে রোযা নষ্ট করে এবং কেবল কাযা ওয়াজেব করে তা নিম্নরূপ ঃ-

২। বীর্যপাত ঃ

রোযা নষ্টকারী কর্মাবলীর মধ্যে জাগ্রত অবস্থায় সকাম যৌন-স্বাদ অনুভূতির সাথে বীর্যপাত অন্যতম; চাহে সে বীর্যপাত (নিজ অথবা স্ত্রীর) হস্তমৈথুন দ্বারা হোক অথবা কোলাকুলি দ্বারা, নচেৎ চুম্বন

অথবা প্রচাপন দ্বারা। কারণ, উক্ত প্রকার সকল কর্মই হল এক এক শ্রেণীর যৌনাচার। অথচ মহান আল্লাহ (হাদীসে কুদসীতে) বলেন, “সে আমার (সন্তুষ্টি লাভের) আশায় নিজের প্রয়োজনীয় পানাহার ও যৌনাচার পরিহার করে।” *(বুঃ ১৮৯৪, মুঃ ১১৫১নং)* আর যে ব্যক্তি যে কোন প্রকারে নিজ যৌন অনুভূতিকে উত্তেজিত করে তৃপ্তির সাথে বীর্যপাত করে, সে আসলেই নিজের যৌন-কামনা চরিতার্থ করে থাকে এবং তার রোযাতে সেই কর্ম বর্জন করে না, যা আল্লাহর উক্ত বাণীতে পানাহারের অনুরূপ। *(মুমঃ ৬/৩৮৭)*

পরন্তু রোযাদারের জেনে রাখা উচিত যে, হস্ত অথবা অন্য কিছু দ্বারা বীর্যপাত ঘটানো যেমন রোযার মাসে হারাম, তেমনি অন্য মাসেও। কিন্তু রমযানে তা অধিকরূপে হারাম। যেহেতু এ মাসের রয়েছে পৃথক মর্যাদা এবং তাতে হয়েছে রোযা ফরয। *(ফারারাঃ ৬১পৃঃ)*

৩। পানাহার ঃ

পানাহার বলতে পেটের মধ্যে যে কোন প্রকারে কোন খাদ্য অথবা পানীয় পৌঁছানোকে বুঝানো হয়েছে; চাহে তা মুখ দিয়ে হোক অথবা নাক দিয়ে, পানাহারের বস্তু যেমনই হোক; উপকারী বা উপাদেয় হোক অথবা অপকারী বা অনুপাদেয়, হালাল হোক অথবা হারাম, অল্প হোক অথবা বেশী।

বলা বাহুল্য, (বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা প্রভৃতির) ধূমপান রোযা নষ্ট করে দেয়; যদিও তা অপকারী, অনুপাদেয় ও হারাম পানীয়।

প্লাস্টিক বা কোন ধাতুর মালা গিলে ফেললে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে; যদিও তা পেটে গেলে দেহের কোন উপকার সাধন হবে না।

তদনরূপ যদি কেউ কোন অপবিত্র বা হারাম বস্তু ভক্ষণ করে, তাহলে তারও রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। *(দ্রঃ মুমঃ ৬/৩৭৯, ৪৮ঃ ১৪পৃঃ)*

৪। যা এক অর্থে পানাহার ঃ

স্বাভাবিক পানাহারের পথ ছাড়া অন্য ভাবে পানাহারের কাজ নিলে তাতেও রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন খাবারের কাজ দেয় এমন (স্যালাইন ইঞ্জেকশন) নিলে রোযা হবে না। কেননা, তাতে পানাহারের অর্থ বিদ্যমান।

৫। ইচ্ছাকৃত বমি করা ঃ

ইচ্ছাকৃত বমি করলে, অর্থাৎ পেটে থেকে খাওয়া খাদ্য (বমন ও উদ্‌গিরণ করে) বের করে দিলে, মুখে আঙ্গুল ভরে, পেট নিঙ্‌রে, কোন বিকট দুর্গন্ধ জাতীয় কিছুর ঘ্রাণ নাকে নিয়ে, অথবা অরুচিকর ঘৃণ্য কিছু দেখে উল্‌টি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ঐ রোযার কাযা জরুরী। *(দ্রঃ মুমঃ ৬/৩৮৫, ৭০ঃ ৫৩নং)* পক্ষান্তরে সামলাতে না পেরে অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হয়ে গেলে রোযা নষ্ট হয় না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, “রোযা অবস্থায় যে ব্যক্তি বমনকে দমন করতে সক্ষম হয় না, তার জন্য কাযা নেই। পক্ষান্তরে যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে, সে যেন ঐ রোযা কাযা করে।” *(আঃ ২/৪৯৮, আদাঃ ২৩৮০, তিঃ ৭১৬, ইমাঃ ১৬৭৬, দাঃ ১৬৮০, ইখুঃ ১৯৬০, ইহিঃ মাওয়ারিদ ৯০৭নং, হাঃ ১/৪২৭, দারাঃ, বাঃ ৪/২১৯ প্রমুখ, ইগঃ ৯৩০, সজাঃ ৬২৪৩নং)*

৬। মহিলার মাসিক অথবা নিফাস শুরু হওয়াঃ

মহিলার মাসিক অথবা নিফাসের খুন বের হতে শুরু হলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যায়। যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার সামান্য ক্ষণ পূর্বে খুন দেখা দেয়, তাহলে তার ঐ দিনের রোযা বাতিল এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সামান্য ক্ষণ পরে দেখা দিলে তার ঐ দিনের রোযা শুদ্ধ। *(৪৮ঃ ১৫পৃঃ)*

১০। বেহুশ হওয়াঃ

রোযাদার যদি ফজর থেকে নিয়ে মাগরেব পর্যন্ত বেহুশ থাকে, তাহলে তার রোযা শুদ্ধ হবে না এবং তাকে ঐ দিনের রোযা কাযা রাখতে হবে।

রোযা নষ্ট হওয়ার শর্তাবলী

উপর্যুক্ত রোযা নষ্টকারী (মাসিক ও নিফাসের খুন ব্যতীত) সকল জিনিস কেবল তখনই রোযা নষ্ট করবে, যখন তার সাথে ৩টি শর্ত অবশ্যই পাওয়া যাবে। আর সে শর্ত ৩টি নিম্নরূপঃ-

রোযাদার জানবে যে, এই জিনিস এই সময়ে ব্যবহার করলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ, তা ব্যবহার করার সময় তার এ কথা অজানা থাকলে চলবে না যে, এই জিনিস রোযা নষ্ট করে অথবা এখন রোযার সময়।

তা যেন মনে স্মরণ রাখার সাথে ব্যবহার করে; ভুলে গিয়ে নয়।

তা যেন নিজস্ব ইচ্ছা ও এখতিয়ারে ব্যবহার করে; অপরের তরফ

থেকে বাধ্য হয়ে নয়।

কেননা, মহান আল্লাহ বলেন,

(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ)

অর্থাৎ, কোন ব্যাপারে তোমরা ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই; কিন্তু ইচ্ছাকৃত করলে অপরাধ আছে। *(কুঃ ৩৩/৫)*

রমযানে যে যে কাজ করা রোযাদারের কর্তব্য

মাহাত্ম্যপূর্ণ রমযান মাসে কি কি নেক কাজ করা কর্তব্য তা উল্লেখ করার পূর্বে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় ঃ-

১। এই মৌসমের মূল্য ও মাহাত্ম্য প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করা। আপনি এ কথা স্মরণে রাখবেন যে, যদি এই সওয়াবের মৌসম আপনার হাত ছাড়া হয়ে যায়, তাহলে তা পুনরায় ফিরে পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া এটি হল সংকীর্ণ সময়ের একটি সুবর্ণ সুযোগ। আল্লাহ সত্যই বলেছেন, “তা গোনা-গাঁথা কয়েকটি দিন।” *(কুঃ ২/১৮৪)* ‘রমযান এসে গেল’ এবং ‘রমযান শেষ হয়ে গেল’ লোকেদের এই উভয় উক্তির মাঝে ব্যবধান কত সংকীর্ণ! এ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অস্পষ্ট উপলব্ধি থাকা যথেষ্ট নয় যে, রমযান মাস হল একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ মৌসম।

২। মর্যাদা ও সওয়াবের দিক থেকে আমলসমূহের মাঝে তারতম্য আছে। সুতরাং তাতে কোন আমল বড়। আবার কোন আমল ছোট।

কোন আমল আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়; কিন্তু অন্য কোন আমল তাঁর নিকট অধিক পছন্দনীয়। অতএব মুসলিমের উচিত, সেই আমল করতে অধিক চেষ্টা ও যত্নবান হওয়া, যা সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ আমল, মহান আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় এবং সওয়াবের দিক থেকে অধিক মর্যাদাসমৃদ্ধ। *(কানামিরাঃ ৪৬পৃঃ)*

১। তারাবীহর নামায বা কিয়ামে রামাযান

কিয়ামে রামাযান বা রমযানের কিয়ামকে স্বালাতুত তারাবীহ বা তারাবীহর নামায বলা হয়। 'তারাবীহ' মানে হল আরাম করা। যেহেতু সলফে সালেহীনগণ ৪ রাকআত নামায পড়ে বিরতির সাথে বসে একটু আরাম নিতেন, তাই তার নামও হয়েছে তারাবীহর নামায। আর ঐ আরাম নেওয়ার দলীল হল মা আয়েশার হাদীস; যাতে তিনি বলেন, 'নবী ﷺ ৪ রাকআত নামায পড়তেন। সুতরাং তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না। (অর্থাৎ অত্যন্ত সুন্দর ও দীর্ঘ হত।) অতঃপর তিনি ৪ রাকআত নামায পড়তেন। সুতরাং তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না। অতঃপর তিনি ৩ রাকআত (বিত্র) নামায পড়তেন।' *(বুঃ ১১৪৭, মুঃ ৭৩৮নং)*

v তারাবীহর নামাযের মান ও তার মাহাত্ম্য ঃ

তারাবীহর নামায নারী-পুরুষ সকলের জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। বহু হাদীসগ্রন্থে হযরত আবূ হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ কিয়ামে রামাযানের ব্যাপারে (সকলকে)

উৎসাহিত করতেন; কিন্তু তিনি বাধ্যতামূলকরূপে আদেশ দিতেন না। তিনি বলতেন, “যে ব্যক্তি ঈমান রেখে সওয়াবের আশায় রমযানের কিয়াম করবে, সে ব্যক্তির পূর্বকৃত পাপসমূহ মাফ হয়ে যাবে।” *(আঃ ২/২৮১, ৫২৯, বুঃ ১৯০১, মুঃ ৭৫৯, সআদাঃ ১২২২, সতিঃ ৬৪৮নং)*

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘একদা নবী ﷺ মসজিদে নামায পড়লেন। তাঁর অনুসরণ (ইক্তিদা) করে অনেক লোক নামায পড়ল। অতঃপর পরের রাতে নামায পড়লে লোক আরো বেশী হল। তৃতীয় রাতে লোকেরা জমায়েত হলে তিনি বাসা থেকে বের হলেন না। ফজরের সময় তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, “আমি তোমাদের আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। তোমাদের নিকট (নামাযের জন্য) বের হতে আমার কোন বাধা ছিল না। কিন্তু আমি আশঙ্কা করলাম যে, ঐ নামায তোমাদের জন্য ফরয করে দেওয়া হবে।” আর এ ঘটনা হল রমযানের।’ *(বুঃ ২০১২, মুঃ ৭৬১নং)*

v তারাবীহর সময়ঃ

তারাবীহর নামায আদায় করার সময় হল, রমযানের (চাঁদ দেখার রাত সহ) প্রত্যেক রাত্রে এশার ফরয ও সুন্নত নামাযের পর বিত্র পড়ার আগে। অবশ্য শেষ রাত্রে ফজর উদয় হওয়ার আগে পর্যন্ত এর সময় বিস্তীর্ণ। যেহেতু মহানবী ﷺ প্রথম রাত্রে তার প্রথম ভাগে শুরু করে রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত নামায পড়েছিলেন। দ্বিতীয় রাত্রেও তার প্রথম ভাগে শুরু করে রাত্রের অর্ধেকাংশ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত নামায পড়েছিলেন এবং তৃতীয় রাত্রে তার প্রথম ভাগে শুরু করে শেষ রাত অবধি নামায

পড়েছিলেন। *(সআদাঃ ১২২৭, সতিঃ ৬৪৬, সনাঃ ১৫১৪, সইমাঃ ১৩২৭নং)*

v তারাবীহর রাকআত-সংখ্যা ঃ

সুন্নত ও আফযল হল এই নামায বিত্র সহ ১১ রাকআত পড়া। মহানবী ﷺ-এর রাতের নামায সম্বন্ধে সর্বাধিক বেশী খবর রাখতেন যিনি, সেই আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, রমযানে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নামায কত রাকআত ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি রমযানে এবং অন্যান্য মাসেও ১১ রাকআত অপেক্ষা বেশী নামায পড়তেন না।' *(বুঃ ১১৪৭, মুঃ ৭৩৮-নং)*

v এই নামাযের ক্বিরাআত ঃ

মহানবী ﷺ রাতের কিয়ামকে খুব লম্বা করতেন। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী ﷺ ৪ রাকআত নামায পড়তেন। সুতরাং তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না। (অর্থাৎ অত্যন্ত সুন্দর ও দীর্ঘ হত।) অতঃপর তিনি ৪ রাকআত নামায পড়তেন। সুতরাং তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না। অতঃপর তিনি ৩ রাকআত (বিত্র) নামায পড়তেন।' *(বুঃ ১১৪৭, মুঃ ৭৩৮-নং)*

হুযাইফা رضي الله عنه বলেন, 'একদা তিনি এক রাকআতে সূরা বাক্বারাহ, আ-লি ইমরান ও নিসা ধীরে ধীরে পাঠ করেন।' *(মুঃ ৭৭২, নাঃ ১০০৮, ১১৩২নং)*

হযরত উমার رضي الله عنه-এর যামানায় সলফগণ তারাবীহর নামাযের ক্বিরাআত লম্বা করে পড়তেন। পূর্ণ নামাযে প্রায় ৩০০টি আয়াত

পাঠ করতেন। এমন কি এই দীর্ঘ কিয়ামের কারণে অনেকে লাঠির উপর ভর করে দাঁড়াতেন এবং ফজরের সামান্য পূর্বে তাঁরা নামায শেষ করে বাসায় ফিরতেন। সেই সময় খাদেমরা সেহরী খাওয়া সম্ভব হবে না -এই আশঙ্কায় খাবার নিয়ে তাড়াতাড়ি করত। *(মাঃ ২৪৯, ২৫১, ২৫২, মিঃ ১/৪০৮ আলবানীর টীকা দ্রঃ)*

তাঁরা ৮ রাকআতে সূরা বাক্বারাহ পড়ে শেষ করতেন এবং তা ১২ রাকআতে পড়া হলে মনে করা হত যে, নামায হাল্কা হয়ে গেল। *(ঐ)*

v তাড়াহুড়া না করে সুন্দরভাবে তারাবীহ পড়া ঃ

ইমামের জন্য উচিত নয়, নামাযে জলদিবাজি করা এবং কাকের দানা খাওয়ার মত ঠকাঠক নামায শেষ করা। যেহেতু মহানবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম এ নামাযকে খুবই লম্বা করে পড়তেন; যেমন পূর্বে এ কথা আলোচিত হয়েছে। মহানবী ﷺ-এর রুকূ ও সিজদাহ প্রায় তাঁর কিয়ামের মতই দীর্ঘ হত। আর এত লম্বা সময় ধরে তিনি সিজদায় থাকতেন যে, সেই সময়ে প্রায় ৫০টি আয়াত পাঠ করা যেতে পারে। *(বুঃ ১১২৩নং দ্রঃ)*

সুতরাং এ কথা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে যে, আমরা আমাদের তারাবীহর নামাযকে তাঁদের নামাযের কাছাকাছি করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমরাও ক্বিরাআত লম্বা করব, রুকূ, সিজদাহ ও তার মাঝে কওমা ও বৈঠকে তসবীহ ও দুআ অধিকাধিক পাঠ করব। যাতে আমাদের মনে কিঞ্চিৎ পরিমাণ হলেও যেন বিনয়-নম্রতা অনুভূত হয়; যে বিনয়-নম্রতা হল নামাযের প্রাণ ও মস্তিষ্ক।

v কিয়ামুল লাইল-এর কাযা ঃ

যে ব্যক্তি কোন ওযরবশতঃ রাতের নামায (তারাবীহ, তাহাজ্জুদ বা কিয়াম) পড়তে সুযোগ না পায়, সে যদি দিনে তা কাযা করে নেয়, তাহলে তা তার জন্য বৈধ এবং তাতে সওয়াব ও ফযীলতও আছে। তবে বিতর সহ সে কাযা তাকে জোড় বানিয়ে পড়তে হবে। বলা বাহুল্য, তার অভ্যাস মত ১১ রাকআত কিয়াম ছুটে গেলে, দিনের বেলায় ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে ১২ রাকআত নামায কাযা পড়বে।

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী ﷺ-এর তাহাজ্জুদ ঘুম বা ব্যথা-বেদনা ইত্যাদি কারণে ছুটে গেলে দিনে ১২ রাকআত কাযা পড়তেন। *(মুঃ ৭৪৬নং)*

২। কুরআন তেলাঅত

রমযান মাস কুরআনের মাস। "রমযান মাস; যে মাসে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" *(কুঃ ২/১৮৫)*

জিবরীল عليه السلام রমযানের প্রত্যেক রাত্রে মহানবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে কুরআন পাঠ করাতেন। *(বুঃ ৬, মুঃ ২৩০৮-নং)*

হযরত ফাতিমা (রাঃ) বলেন, আব্বা বলেছেন যে, জিবরীল عليه السلام প্রত্যেক বছর একবার করে তাঁর উপর কুরআন পেশ করতেন (পড়ে শুনাতেন)। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের বছরে দুইবার কুরআন

পেশ করেন। *(বুঃ ১০৮৮-পৃঃ)*

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে এই নির্দেশ পাওয়া যায় যে, রমযান মাসে কুরআন পঠন-পাঠন করা, এ উদ্দেশ্যে জমায়েত হওয়া এবং অপেক্ষাকৃত বড় হাফেয বা কারীর কাছে কুরআন পেশ করা (হিফ্য পুনরাবৃত্তি করা) মুস্তাহাব। আর তাতে এ কথারও দলীল রয়েছে যে, রমযান মাসে বেশী বেশী করে কুরআন তেলাঅত করা উত্তম।

প্রথমোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, জিবরীল ﷷ মহানবী ﷺ-এর সাথে রাত্রিতে কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। আর তাতে বুঝা যায় যে, রমযানের রাতে অধিকাধিক কুরআন তেলাঅত করা মুস্তাহাব। যেহেতু রাতে কোন রকম ব্যস্ততা থাকে না, রাতে ইবাদত করতে মনের উদ্দীপনা সুসংবদ্ধ থাকে এবং হৃদয়-মন ও রসনা কুরআন উপলব্ধি করতে সমপ্রয়াসী হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

(إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَّأَقْوَمُ قِيْلاً)

অর্থাৎ, নিশ্চয় রাত্রি জাগরণ মনের একাগ্রতা ও হৃদয়ঙ্গমের জন্য অতিশয় অনুকূল। *(কুঃ ৭৩/৬)*

সলফে সালেহীন রমযান মাসে বেশী বেশী কুরআন পাঠ করতেন। তাঁদের কেউ কেউ প্রত্যেক ৩ রাতে কিয়ামে পূর্ণ কুরআন খতম করতেন। কেউ কেউ খতম করতেন ৭ রাতে; এঁদের মধ্যে কাতাদাহ অন্যতম। কিছু সলফ ১০ রাতে খতম করতেন; এঁদের মধ্যে আবূ রাজা উতারিদী অন্যতম। আসওয়াদ রমযানের প্রত্যেক ২ রাতে কুরআন খতম করতেন। নাখয়ী রমযানের শেষ দশকে ২ রাতে এবং তার পূর্বে ৩ রাতে কুরআন খতম করতেন। রমযান মাস

প্রবেশ করলে যুহরী বলতেন, ‘এ মাস তো কুরআন তেলাঅত এবং মিসকীনদেরকে খাদ্য দান করার মাস।’ ইমাম মালেক রমযান এলে হাদীস পড়া এবং আহলে ইল্‌মদের বৈঠকে বসা বাদ দিয়ে মুসহাফ দেখে কুরআন পড়তে যত্নবান হতেন। সুফিয়ান সওরী রমযান মাস প্রবেশ করলে সকল ইবাদত ত্যাগ করে কুরআন তেলাঅত করতে প্রয়াসী হতেন। *(লামাঃ ইবনে রজব ১৭২, ১৭৯, ১৮১-১৮২ পৃঃ, কানামিরাঃ ৪৮-৪৯পৃঃ, কানারাঃ ১৭পৃঃ, হাসাঃ ১১পৃঃ দ্রঃ)*

এ কথা বিদিত যে, ২ রাতে কুরআন খতম করা বিধেয় নয়। কারণ মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি ৩ রাতের কমে কুরআন পড়ে, সে তা বুঝে না।” *(আদাঃ, তিঃ, ইমাঃ, দাঃ, সজাঃ ৭৭৪৩নং)* কিন্তু ইবনে রজব (রঃ) বলেন, ৩ রাতের কম সময়ে কুরআন পড়তে যে নিষেধ এসেছে, তা আসলে নিয়মিতভাবে সারা বছরে করলে নিষিদ্ধ। নচেৎ, মর্যাদা ও মাহাত্ম্যপূর্ণ সময়; যেমন রমযান মাসে এবং বিশেষ করে যে সকল রাত্রে শবেকদর অনুসন্ধান করা হয় সে সকল রাত্রে অথবা মর্যাদা ও মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থান; যেমন মক্কায় বহিরাগত ব্যক্তির জন্য বেশী বেশী করে কুরআন তেলাঅত করা মুস্তাহাব। যাতে মর্যাদা ও মাহাত্ম্যপূর্ণ ঐ সময় ও স্থানের যথার্থ কদর করা হয়। এ কথা বলেছেন আহমাদ, ইসহাক প্রমুখ ইমামগণ। আর এরই উপর আমল হল অন্যান্যদের; যেমন উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা সে কথা স্পষ্ট হয়। *(কানামিরাঃ ৪৮-৪৯পৃঃ, কানারাঃ ১৭পৃঃ, হাসাঃ ১১পৃঃ দ্রঃ)*

এ কথা অবিদিত নয় যে, যে কুরআন তেলাঅত তেলাঅতকারীর জন্য সম্যক্‌ উপকারী, তা হল তার আয়াতের অর্থ, আদেশ ও

নিষেধ অনুধাবন করে ও বুঝে তেলাঅত। সুতরাং তেলাঅতকারী যদি এমন কোন আয়াত পড়ে, যাতে আল্লাহ তাকে কিছুর আদেশ করেছেন, তাহলে তা পালন করে। অনুরূপ এমন কোন আয়াত পড়ে, যাতে আল্লাহ তাকে কিছু নিষেধ করেছেন, তাহলে তা বর্জন করে ও তা থেকে বিরত হয়। কোন রহমতের আয়াত তেলাঅত করলে আল্লাহর কাছে রহমত ভিক্ষা করে এবং তাঁর নিকট দয়ার আশা করে। আযাবের আয়াত পাঠ করলে আল্লাহর নিকট তা থেকে পানাহ চায় এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। যে তেলাঅতকারী এমন করে, আসলে সেই কুরআন অনুধাবন করে এবং তার উপর আমল করে। আর তারই জন্য কুরআন হবে স্বপক্ষের দলীল। পক্ষান্তরে যে তেলাঅতকারী কুরআন অনুযায়ী আমল করে না, সে তাতে উপকৃতও হয় না। আর কুরআন তার বিরুদ্ধে দলীল হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٩

অর্থাৎ, আমি এই বর্কতময় কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে। *(কুঃ ৩৮/২৯) (ইতহাফঃ ৫১-৫২পৃঃ দ্রঃ)*

মসজিদে কুরআন তেলাঅত করলে এমন উচ্চস্বরে করা উচিত নয়, যাতে নামাযীদের ডিষ্টার্ব হয়। যেহেতু মহানবী ﷺ এ ব্যাপারে নিষেধ করে বলেন, “অবশ্যই নামাযী তাঁর প্রভুর কাছে মুনাজাত করে। অতএব তার লক্ষ্য করা উচিত, সে কি দিয়ে তাঁর কাছে

মুনাজাত করছে। আর তোমাদের কেউ যেন অপরের কাছে উচ্চস্বরে কুরআন না পড়ে।” *(আঃ, ত্বাবঃ, সআদাঃ ১২০৩নং, সজাঃ ১৯৫১নং) (যাসাফাকাঃ ১৯পৃঃ)*

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কুরআন পড়া ভাল, নাকি শোনা ভাল। আসলে উত্তম হল তাই করা, যা মনোযোগের জন্য এবং প্রভাবান্বিত হওয়ার দিক থেকে বেশী উত্তম। কারণ, তেলাঅতের উদ্দেশ্য হল, আয়াতের অর্থ অনুধাবন, হৃদয়ঙ্গম ও মহান আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমল। *(সালাতাঃ ৪৬পৃঃ)*

সাধারণভাবে কুরআন তেলাঅতের রয়েছে বিশাল মর্যাদা এবং বিরাট সওয়াব। মহানবী ﷺ বলেন, “তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেন না তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে। ---” *(মুঃ, আঃ, সজাঃ ১১৬৫নং)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব হতে একটি মাত্র অক্ষর পাঠ করে সে ব্যক্তি একটি নেকী লাভ করে। আর একটি নেকী দশগুণ বর্ধিত করা হয়। আমি বলছি না যে, ‘আলিফ-লাম-মীম’ একটি অক্ষর। বরং ‘আলিফ’ একটি অক্ষর, ‘লাম’ একটি অক্ষর এবং ‘মীম’ একটি অক্ষর।” *(বুঃ তারীখ, তিঃ, হাঃ, সজাঃ ৬৪৬৯ নং)*

সুতরাং আপনি তাদের দলভুক্ত হন, যারা কুরআন যথার্থরূপে (তার হক আদায় করে) তেলাঅত করে। আপনি মসজিদে, নিজ বাসস্থানে এবং কর্মস্থলে কুরআন তেলাঅত করুন।

আর এ কথা বিদিত যে, উপযুক্ত সময় মনের উপর কুরআনের প্রভাব ফেলতে বড় সহায়ক হয়। তাতে মুসলিমের হেদায়াতের

উপর হেদায়াত এবং আলোর উপর আলো বৃদ্ধি পায়। আর রমযান মাস হল কুরআন তেলাঅত ও তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। যেহেতু কুরআন মুসলিমের রূহের খোরাক। রমযানে মন্দ-প্রবণ আত্মার আধিপত্য দুর্বল হয়ে পড়ে। যার ফলে আত্মা উন্নতি লাভ করে, কুরআনের খোরাক পেয়ে সবল হয়ে ওঠে এবং মুসলিম আল্লাহর বাণী দ্বারা পরিপূর্ণ উপকৃত হতে পারে।

৩। উমরাহ

রমযান মাসে উমরাহ করা বড় ফযীলতপূর্ণ সওয়াবের কাজ। মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই রমযানের উমরাহ একটি হজ্জ অথবা আমার সাথে একটি হজ্জ করার সমতুল্য।" *(বুঃ ১৮৬৩, মুঃ ১২৫৬নং)*

অতএব চেষ্টা করুন, যাতে আপনার এত বড় সওয়াব এবং এত মর্যাদাসম্পন্ন মৌসম হাতছাড়া না হয়ে যায়। আর এ কাজে আপনার তওফীক হলে অবশ্যই উমরাহ আদায় করার নিয়ম-পদ্ধতি জেনে নিন। যাতে আপনার উমরাহ মহানবী ﷺ-এর তরীকা অনুযায়ী আদায় হয়।

৪। শেষ দশকের আমল ও ইবাদত

মহানবী ﷺ রমযানের শেষ দশকে ইবাদত করতে যে মেহনত ও চেষ্টা করতেন, মাসের অন্যান্য দিনগুলিতে তা করতেন না। *(মুঃ*

১১৭৫নং) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রমযানের শেষ দশক এসে উপস্থিত হলে আল্লাহর রসূল ﷺ (ইবাদতের জন্য) নিজের কোমর (লুঙ্গি) বেঁধে নিতেন, সারারাত্রি জাগরণ করতেন এবং আপন পরিজনকেও জাগাতেন।” *(বুঃ ২০২৪নং, আঃ ৬/৪১, আদাঃ ১৩৭৬, নাঃ ১৬৩৯, ইমাঃ ১৭৬৮, ইখুঃ ২২১৪নং)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি নিজে সারারাত্রি জাগরণ করতেন এবং আপন পরিজনকেও জাগাতেন। ইবাদতে মেহনত করতেন এবং কোমর (বা লুঙ্গি) বেঁধে নিতেন। *(মুঃ ১১৭৪নং)*

(ক) মহানবী ﷺ রমযানের শেষ দশকে অতিরিক্ত কিছু এমন আমল করতেন, যা মাসের অন্যান্য দিনগুলিতে করতেন না। যেমন, তিনি রাত্রি জাগরণ করতেন। সম্ভবতঃ তিনি সারারাত্রি জাগতেন; অর্থাৎ পুরো রাতটাই নামায ইত্যাদিতে মশগুল থাকতেন।

অথবা তিনি পুরো রাতটাই কিয়াম করতেন। অবশ্য এরই মধ্যে তিনি রাতের খাবার ও সেহরী খেতেন। এ ক্ষেত্রে রাত্রি জাগরণের মানে হবে অধিকাংশ বা প্রায় সম্পূর্ণ রাতটাই জাগতেন। আর মা আয়েশার একটি কথা এই ব্যাখ্যার সমর্থন করে। তিনি বলেন, আমি জানি না যে, তিনি কোন রাত্রি ফজর পর্যন্ত কিয়াম করেছেন। *(মুঃ ৭৪৬, নাঃ ১৬৪১নং)*

(খ) মহানবী ﷺ এই রাতগুলিতে নামায পড়ার জন্য নিজের পরিবারের সকলকে জাগাতেন। আর এ কথা বিদিত যে, তিনি বছরের অন্যান্য মাসেও পরিবারকে নামাযের জন্য জাগাতেন।

তাহাজ্জুদ পড়ার শেষে বিত্র পড়ার আগে আয়েশা (রাঃ)কে জাগাতেন। *(বুঃ ৯৫২নং)* কোন কোন রাতে আলী ও ফাতেমার নিকট উপস্থিত হয়ে বলতেন, "তোমরা কি উঠে নামায পড়বে না?" *(আঃ ১/১১২, বুঃ ১১২৭, মুঃ ৭৭৫নং)* কিন্তু তিনি তাদেরকে রাত্রের কিছু অংশ নামায পড়ার জন্য জাগাতেন। বলা বাহুল্য, বছরের অন্যান্য রাতের তুলনায় শেষ দশকের রাতগুলিতে জাগানো ছিল ভিন্নতর। *(দ্রঃ দুরাঃ ৮৬পৃঃ)*

(গ) মহানবী ﷺ শেষ দশকের রাতগুলিতে নিজের লুঙ্গি বেঁধে নিতেন। এ কথায় ইঙ্গিতে তাঁর ইবাদতের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি এবং চিরাচরিত অভ্যাসের তুলনায় অতিরিক্ত প্রচেষ্টাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি কোমরে কাপড় বেঁধে ইবাদতে লেগে যেতেন।

অথবা তাতে ইঙ্গিতে স্ত্রী-সংস্পর্শ ও সহবাস ত্যাগ করার কথা বুঝানো হয়েছে। আর এই বুঝটাই সঠিকতর বলে মনে হয়।

সুতরাং উক্ত রাতগুলির নামাযের মাহাত্ম্য ও প্রতিদান যখন এত বড়, তখন আমাদের উচিত, তার পবিত্র সময়গুলিকে অযথা নষ্ট না করে ফেলা এবং উক্ত সময়গুলিকে পরিপূর্ণরূপে কাজে লাগানো। আর আমরা তাদের মত যেন না হই, যারা এ মাসের শুরুতে বড় যত্নশীলতা ও অনুরাগ প্রদর্শন করে, অতঃপর ধীরে ধীরে পশ্চাদ্পদ হয়ে ফিরে আসে। অবশেষে যখন মাসের শেষ তৃতীয়াংশ এবং সেই পুণ্যময় সময় এসে উপস্থিত হয় যাতে বেশী বেশী সওয়াব ও নেকী লাভ করা যায়, তখন তারা কুরআন তেলাঅত, তারাবীহ ও রাতের নামায পড়ার ব্যাপারে শৈথিল্য ও আলস্য প্রদর্শন করে!

৫। ই’তিকাফ

শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় বিশেষ ব্যক্তির মসজিদের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে সেখানে অবস্থান করা; তথা সকল মানুষ ও সংসারের সকল কাজকর্ম থেকে দূরে থাকা এবং সওয়াবের কাজ; নামায, যিক্‌র ও কুরআন তেলাঅত ইত্যাদি ইবাদতের জন্য একমন হওয়াকে ই’তিকাফ বলা হয়। *(দ্রঃ ফিসুঃ ১/৪১৯, আসাইঃ ১৯১পৃঃ, তাইরাঃ ২৬পৃঃ)*

v ই’তিকাফের মান ঃ

রমযান মাসে করণীয় যে সব সওয়াবের কর্ম বিশেষভাবে তাকীদপ্রাপ্ত, তার মধ্যে ই’তিকাফ অন্যতম। ই’তিকাফ সেই সকল সুন্নাহর একটি, যা প্রত্যেক বছরের এই রমযান মাসে - বিশেষ করে এর শেষ দশকে - মহানবী ﷺ বরাবর করে গেছেন।

আবূ হুরাইরা رضي الله عنه বলেন, নবী ﷺ প্রত্যেক রমযানে ১০ দিন ই’তিকাফ করতেন। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের বছরে তিনি ২০ দিন ই’তিকাফ করেন। *(বুঃ ২০৪৪নং)*

বলাই বাহুল্য যে, ই’তিকাফ সকল প্রকার ব্যস্ততা ও ব্যাপৃতি থেকে দূরে থেকে, অতিরিক্ত পান-ভোজন হতে বিরত থেকে এবং কুরআন তেলাঅত, যিক্‌র-আযকার ও রাতের নামাযের মাধ্যমে রূহের তরবিয়ত ও মনের খেয়াল-খুশীর বিরুদ্ধে জিহাদ করার একটি বড় সুযোগ।

v ই’তিকাফকারীর জন্য যা করা মুস্তাহাব ঃ

১। ই’তিকাফকারীর জন্য বেশী বেশী নফল ইবাদত করা, নিজেকে নামায, কুরআন তেলাঅত, যিক্র, ইস্তিগফার, দরূদ ও সালাম, দুআ ইত্যাদি ইবাদতে মশগুল রাখা মুস্তাহাব; যে ইবাদত দ্বারা বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে এবং মুসলিম তার মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক কায়েম করতে পারে।

প্রকাশ যে, শরয়ী ইল্ম আলোচনা করা, (দ্বীনী বই-পুস্তক পাঠ করা,) তফসীর, হাদীস, আম্বিয়া ও সালেহীনদের জীবনী গ্রন্থ পাঠ করা এবং দ্বীনে ইসলাম ও ফিক্হ সম্বন্ধীয় যে কোন বই-পুস্তক পাঠ করাও উক্ত ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত। *(ফিসুঃ ৪/৪২৩)*

২। ই’তিকাফকারী অপ্রয়োজনীয় ও বাজে কথা বলা থেকে দূরে থাকবে এবং তর্কাতর্কি, হুজ্জত-ঝগড়া ও গালাগালি করা থেকে বিরত থাকবে।

৩। মসজিদের ভিতরে একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে সেখানে অবস্থান করবে। নাফে’ বলেন, ‘আব্দুল্লাহ বিন উমার মসজিদের সেই জায়গাটিকে দেখিয়েছেন, যে জায়গায় আল্লাহর রসূল ﷺ ই’তিকাফ করতেন।’ *(মুঃ ১১৭১নং)*

v ই’তিকাফকারীর জন্য যা করা বৈধ ঃ

১। অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ই’তিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হতে পারে। যেমন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পানাহার করতে, পরনের কাপড় বা শীতের ঢাকা আনতে এবং পেশাব-পায়খানা করতে বের হওয়া বৈধ। তদনুরূপ শরয়ী প্রয়োজনে; যেমন নাপাকীর গোসল

করতে অথবা ওযূ করতে মসজিদের বাইরে যাওয়া অবৈধ নয়। *(মুমঃ ৬/৫২৩)*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, '(ই'তিকাফের সময়) নবী ﷺ ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়া ঘরে আসতেন না।'

তিনি আরো বলেন, 'ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নত হল, সে কোন রোগীকে দেখা করতে যাবে না, কোন জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রী-স্পর্শ, কোলাকুলি, বা সঙ্গম করবে না, আর অতি প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হবে না।' *(সআদাঃ ২ ১৬০নং)*

২। মসজিদের ভিতরে ই'তিকাফকারী পানাহার করতে ও ঘুমাতে পারে। তবে মসজিদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার খেয়াল অবশ্যই রাখতে হবে।

৩। নিজের অথবা অন্যের প্রয়োজনে বৈধ কথা বলতে পারে।

৪। মাথা আঁচড়ানো, লম্বা নখ কাটা, দৈহিক পরিচ্ছন্নতার খেয়াল রাখা, সুন্দর পোশাক পরা, আতর ব্যবহার করা ইত্যাদি কর্ম ই'তিকাফকারীর জন্য বৈধ।

মহানবী ﷺ ই'তিকাফ অবস্থায় নিজের মাথাকে মসজিদ থেকে বের করে হুজরায় আয়েশার সামনে ঝুঁকিয়ে দিতেন এবং তিনি মাসিক অবস্থাতেও তাঁর মাথা ধুয়ে দিতেন এবং আঁচড়ে দিতেন। *(বুঃ ২০২৮, ২০৩০, মুঃ ২৯৭নং)*

৫। ই'তিকাফ অবস্থায় যদি পরিবারের কেউ ই'তিকাফকারীর সাথে মসজিদে দেখা করতে আসে, তাহলে তাকে আগিয়ে বিদায় দেওয়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ। হযরত সাফিয়্যাহ

মহানবী ﷺ-কে দেখা করতে এলে তিনি এরূপ করেছিলেন। *(বুঃ ২০৩৫, মুঃ ২১৭৫নং)*

v ই’তিকাফ যাতে বাতিল হয়ে যায় ঃ

১। অতি প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে সামান্য ক্ষণের জন্যও ইচ্ছাকৃত বের হলে ই’তিকাফ নষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু মসজিদে অবস্থান করা ই’তিকাফের জন্য অন্যতম শর্ত অথবা রুক্ন্।

২। স্ত্রী-সহবাস করে ফেললে ই’তিকাফ বাতিল। কারণ মহান আল্লাহ বলেন,

((وَلاَ تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوْهَا))

অর্থাৎ, আর মসজিদে ই’তিকাফরত অবস্থায় তোমরা স্ত্রী-গমন করো না। এ হল আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। অতএব তার নিকটবর্তী হয়ো না। *(কুঃ ২/১৮৭)*

৩। নেশা বা মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফলে জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলে ই’তিকাফ বাতিল হয়ে যায়। কারণ তাতে মানুষের ভালো-মন্দের তমীয থাকে না।

৪। মহিলাদের মাসিক বা নিফাস শুরু হলে ই’তিকাফ বাতিল। কারণ, পবিত্রতা একটি শর্ত।

৫। কোন কথা বা কর্মের মাধ্যমে শির্ক, কুফ্র করলে বা মুর্তাদ্দ্ হয়ে গেলে ই’তিকাফ বাতিল হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

((لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ))

অর্থাৎ, তুমি শির্ক করলে তোমার আমল পন্ড হয়ে যাবে। *(কুঃ ৩৯/৬৫) (ফিসুঃ ১/৪২৬, কানারাঃ ২৭পৃঃ, আসাইঃ ২০৫পৃঃ)*

পরিশেষে বলি যে, আপনি এই মহান সুন্নাহকে জীবিত করার প্রতি যত্নবান হন - আল্লাহ আপনার হিফাযত করুন। যত্নবান হন অবিরত আনুগত্যের মাধ্যমে আপনার হৃদয়কে প্রাণবন্ত করার প্রতি। পূর্ণ বছরের সকল মাস থেকে গোনা-গাঁথা এই কয়টি দিনকে পরকালের পাথেয় অর্জন এবং চিন্তা-ভাবনা করার জন্য খালি করে নিন। এ ই'তিকাফ আমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নত; যা বর্তমানে ত্যক্তরূপে পরিগণিত হয়েছে। সুতরাং কতই না সুন্দর হয়, যদি জামাআতের কিছু লোক মসজিদে কমসে কম কোন এক রাত্রের সূর্যাস্ত থেকে পরদিনের সূর্যোদয় পর্যন্ত ই'তিকাফ করে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হয়।

শবেকদর অনুসন্ধান

শবেকদর বর্কতময় মহিয়সী রজনীসমূহের অন্যতম। শবেকদর জীবনের একটি সুবর্ণ সুযোগ, শবেকদর মাসের শ্রেষ্ঠ রাত। শবেকদর একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ পবিত্র রাত্রি। কতই না মহতী এই রজনী! হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম! সৎ ও দ্বীনদার লোকেরা এই রাতের খোঁজে প্রতিযোগিতা করে থাকেন। প্রত্যেকেই মনে-প্রাণে তা পাওয়ার লোভ রাখেন। প্রত্যেকেই তা পেতে আগ্রহী থাকেন। নিঃসন্দেহে তা বিশাল প্রতিদান! যে প্রতিদান মুসলিম ঐ রাতের

গোনা-গাঁথা মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে অর্জন করতে পারে।

মুস্তাহাব হল, রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিগুলিতে এই রাতের অনুসন্ধান করা। যেহেতু মহানবী ﷺ এর সন্ধানে উক্ত রাত্রিগুলিতেই চেষ্টা চালাতেন। তিনি এই লক্ষ্যেই শেষ দশকে ই'তিকাফ করেছেন।

অবশ্য অধিকাংশ উলামার মতে শেষ দশকের মধ্যে শবেকদর পাওয়ার সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক, মর্যাদাপূর্ণ ও যত্নযোগ্য রাত্রি হল ২৭শের রাত্রি।

v শবেকদরের নাম শবেকদর কেন?

ক্বাদ্‌র মানে তকদীর। সুতরাং লাইলাতুল ক্বাদ্‌র বা শবেকদরের মানে তকদীরের রাত বা ভাগ্য-রজনী। যেহেতু এই রাতে মহান আল্লাহ আগামী এক বছরের জন্য সৃষ্টির রুযী, মৃত্যু ও ঘটনাঘটনের কথা লিপিবদ্ধ করে থাকেন। যেমন তিনি এ কথা কুরআনে বলেন,

((فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ))

অর্থাৎ, এই রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। *(কুঃ ৪৪/৪)*

আর এই তকদীর; যা বাৎসরিক বিস্তারিত আকারে লিখা হয়। এ ছাড়া মাতৃগর্ভে ভ্রূণ থাকা অবস্থায় লিখা হয় সারা জীবনের তকদীর। আর আদি তকদীর; যা মহান আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টি করার ৫০ হাজার বছর পূর্বে 'লাওহে মাহফূয'-এ লিখে রেখেছেন।

v শবেকদরের দুআ ঃ

ভাই রোযাদার! শবেকদরের রাত্রে দুআর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করুন। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি শবেকদর লাভ করলে তাতে কি দুআ পাঠ করব? উত্তরে তিনি বললেন, "তুমি বলো,

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফুউবুন তুহিব্বুল আফওয়া, ফা'ফু আন্নী। *(আঃ ৬/১৭১, ১৮২, ১৮৩, ২৫৮, নাঃ আমালুল ইয়াওমি অল-লাইলাহ ৮৭২নং, ইমাঃ ৩৮৫০, হাঃ ১/৫৩০)*

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফুউবুন কারীমুন তুহিব্বুল আফওয়া, ফা'ফু আন্নী। *(তিঃ ৩৫১৩নং)*

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল (মহানুভব), ক্ষমাকে পছন্দ কর। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

সুতরাং এই রাতে বেশী বেশী করে যিক্র ও দুআ পাঠ করুন। আল্লাহর নিকট বিনতি ও মিনতি প্রকাশ করুন এবং কাঁদুন। যত্নের সাথে এই রাতের মিনিটগুলির; বরং সেকেন্ডগুলির সদ্ব্যবহার করুন। কারণ হতে পারে যে, দ্বিতীয়বার আপনি আর তা ফিরে পাবেন না।

ফিত্বরার বিবরণ

v সাদাকাতুল ফিত্বরার মান ঃ

ফিত্বরার যাকাত আদায় করা ফরয। আল্লাহর রসূল ﷺ এ যাকাতকে মুসলিম উম্মাহর জন্য ফরয করেছেন। ইবনে উমার رضي الله عنه বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ মুসলিমদের স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী এবং ছোট ও বড় সকলের জন্য এক সা' (প্রায় আড়াই কেজি) খেজুর বা যব খাদ্য (আদায়) ফরয করেছেন।' *(বুঃ ১৫০৩, মুঃ ৯৮৪নং)*

v সাদাকাতুল ফিত্বরার হিকমত ঃ

সাদাকাতুল ফিত্বর সন দুই হিজরীর শা'বান মাসে বিধিবদ্ধ হয়। এ সদকাহ ফরয করা হয় রোযাদারকে সেই অবাঞ্ছনীয় অসারতা ও যৌনাচারের মলিনতা থেকে পবিত্র করার জন্য, যা সে রোযা অবস্থায় করে ফেলেছে। এই সদকাহ হবে তার রোযার মধ্যে ঘটিত ত্রুটির সংশোধনী। যেহেতু নেকীর কাজ পাপকে ধ্বংস করে দেয়।

এ সদকাহ ফরয করা হয়েছে, যাতে সেই ঈদের খুশী ও আনন্দের দিনে গরীব-মিসকীনদের সহজলব্ধ আহার হয়। যাতে তারাও ধনীদের সাথে ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে।

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ রোযাদারের অসারতা ও যৌনাচারের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্রতা এবং মিসকীনদের আহার স্বরূপ ফরয করেছেন ---।' *(সআদাঃ ১৪২০, ইমাঃ ১৮২৭, দারাঃ, হাঃ ১/৪০৯, বাঃ ৪/ ১৬৩)*

v কার উপরে ওয়াজেব ঃ

ফিতরার যাকাত প্রত্যেক সেই মুসলিমের উপর ফরয, ঈদের রাত ও দিনে যার একান্ত প্রয়োজনীয় এবং নিজের তথা তার পরিবারের আহারের চেয়ে অতিরিক্ত খাদ্য মজুদ থাকে। আর এ ফরযের ব্যাপারে সকল ব্যক্তিত্ব সমান। এতে স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড়, ধনী ও গরীব, শহরবাসী ও মরুবাসী (বেদুঈন) এবং রোযাদার ও অরোযাদারের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এক কথায় এ যাকাত সকলের তরফ থেকে আদায়যোগ্য।

যার ভরণ-পোষণ করা ওয়াজেব, তার তরফ থেকেও ফিতরার যাকাত আদায় করা ওয়াজেব; যেমন স্ত্রী-সন্তান প্রভৃতি - যদি তারা নিজেদের যাকাত নিজেরা আদায় করতে সক্ষম না হয় তাহলে। অন্যথা তারা নিজেরা নিজেদের ফিতরাহ আদায় করলে সেটাই উত্তম। যেহেতু শরীয়তের আদেশে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সরাসরি সম্বোধন করা হয়। *(মাশারাঃ মজলিস নং ২৮)*

মাতৃজঠরে ভ্রূণের বয়স যদি ১২০ দিন হয়ে থাকে, তাহলে তার পক্ষ থেকেও ফিতরার যাকাত আদায় করা মুস্তাহাব বলে কিছু উলামা মনে করেন। বলা বাহুল্য, ভ্রূণের তরফ থেকে ফিতরাহ আদায় ওয়াজেব নয়। *(ফিযাঃ ২/৯২৭, মুমঃ ৬/১৬২)*

v ফিতরার যাকাতের পরিমাণ কত?

ফিতরার সদকাহ ওয়াজেব হল এক সা’ পরিমাণ। এখানে সা’ বলতে মদীনায় প্রচলিত নববী সা’ উদ্দিষ্ট। পৃথিবীর অন্য কোন অঞ্চলে সা’ প্রচলিত থাকলেও তা যদি মাদানী সা’ থেকে মাপে ভিন্ন হয়,

তাহলে ফিতরাহ আদায়ের ক্ষেত্রে সে সা'-এর মাপ গ্রহণযোগ্য নয়।

নববী সা'-এর মাপ অনুযায়ী বর্তমান যুগে ভাল ধরনের গমের ওজন হয় ২ কেজি ৪০ গ্রাম। *(মুমঃ ৬/১৭৬)* অবশ্য চাল ইত্যাদি সলিড খাদ্য-দ্রব্যের ওজন তার থেকে বেশী হবে। অতএব এক সা' পরিমাণ খাদ্যের মাঝামাঝি ওজন হবে মোটামুটি আড়াই-তিন কেজি মত।

পক্ষান্তরে পরিমাপের সা'-ই হল এ ব্যাপারে মূল মাপযন্ত্র এবং এটাই হল সর্ব যুগ ও সর্বপ্রকার খাদ্যের মাপের জন্য পূর্বসতর্কতামূলক স্থায়ী ব্যবস্থা। এতে ওজনের মতানৈক্য থেকে বাঁচা সম্ভব হয় এবং নিঃসন্দেহে শরীয়তের স্পষ্ট উক্তির উপর আমলও হয়।

v সাদাকাতুল ফিত্বর কোন্ খাদ্য থেকে আদায় করতে হবে?

সাদাকাতুল ফিত্বর দেশের প্রধান খাদ্য থেকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়; যদিও হাদীসে সে খাদ্যের উল্লেখ নেই, যেমন চাল। সুতরাং দেশের প্রধান খাদ্য শস্য, ফল বা গোশ্ত্ যাই হোক না কেন, ফিতরায় তা দান করলে ফিতরা আদায় হয়ে যাবে। তাতে সে খাদ্যের কথা হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ থাক অথবা না থাক। *(মুমঃ ৬/১৮০-১৮৩)*

আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ফিতরায় টাকা-পয়সা, কাঁথা-বালিশ-চাটাই, লেবাস-পোশাক, পশুখাদ্য অথবা কোন আসবাব-পত্র দান করলে তা যথেষ্ট নয়। কারণ, তা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নির্দেশ-বিরোধী। আর তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন

কোন কাজ করে, যাতে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।” *(আঃ ২/১৪৬, বুঃ তা'লীক ১৫৩৯পৃঃ, মুঃ ১৭১৮নং, আদাঃ, ইমাঃ)* “যে ব্যক্তি আমাদের এ ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।” *(আঃ ৬/২৭০, বুঃ ২৬৯৭, মুঃ ১৭১৮, ইমাঃ)*

v ফিতরা কখন ওয়াজেব হয়?

রমযানের শেষ দিনের সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে ফিতরার যাকাত ওয়াজেব হয়। এ সময় হল রমযানের শেষ রোযা ইফতার করার সময়। আর এ সময়ের দিকে সম্বদ্ধ করেই তার নাম হয়েছে ‘সাদাকাতুল ফিত্বর’। বলা বাহুল্য, ইফতার করার সময় বাস্তবায়িত হয় ঈদের রাতের সন্ধ্যায় সূর্য ডোবার সাথে সাথে। অতএব এ সময়ে যে শরীয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত থাকবে কেবল তারই উপর ঐ যাকাত ওয়াজেব এবং তার পরে কেউ আজ্ঞাপ্রাপ্ত হলে তা ওয়াজেব নয়।

যেমন ঈদের রাতের সূর্য ডোবার সামান্যক্ষণ পর যদি কেউ ইসলামে দীক্ষিত হয় অথবা কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে, অথবা শেষ রমযানের সূর্য ডোবার সামান্যক্ষণ পূর্বে যদি কেউ মারা যায়, তাহলে উক্ত প্রকার লোকেদের উপর ফিতরা ওয়াজেব নয়।

v ফিতরা কখন দিতে হবে?

ফিতরা আদায় করার দুটি সময় আছে; তার মধ্যে একটি সময়ে আদায় দিলে ফযীলত পাওয়া যাবে এবং অন্য একটির সময়ে দান করলে যথেষ্ট হয়ে যাবে। প্রথম সময়ে দিতে হয় এবং দ্বিতীয় সময়ে দেওয়া চলে। প্রথম সময়ে দেওয়াই বিধেয় এবং দ্বিতীয় সময়ে

দেওয়া বৈধ।

এই যাকাত আদায়ের ফযীলতের সময় হল, ঈদের সকালে নামাযের পূর্বে। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, 'আমরা নবী ﷺ-এর যুগে ঈদুল ফিত্বরের দিন এক সা' খাদ্য দান করতাম।' *(বুঃ ১৫১০নং)*

ইবনে উমার ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ লোকেদের ঈদের নামাযের জন্য বের হওয়ার পূর্বে ফিতরার যাকাত আদায় দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন।' *(বুঃ ১৫০৯, মুঃ ৯৮৬নং)*

এই জন্যই ঈদুল ফিত্বরের নামায দেরী করে পড়া উত্তম। যাতে ফিতরা আদায় দেওয়ার জন্য সময় সংকীর্ণ না হয়।

এই যাকাত আদায়ের বৈধ সময় হল ঈদের আগে দু-এক দিন। নাফে' বলেন, 'ইবনে উমার ﷺ ছোট-বড় সকলের তরফ থেকে ফিতরা দিতেন; এমন কি আমার ছেলেদের তরফ থেকেও তিনি ফিতরা বের করতেন। আর তাদেরকে দান করতেন, যারা তা গ্রহণ করত। তাদেরকে ঈদের এক অথবা দুই দিন আগে দিয়ে দেওয়া হত।' *(বুঃ ১৫১১, আদাঃ ১৬১০নং)*

এ যাকাত দিতে ঈদের নামাযের পর পর্যন্ত দেরী করা বৈধ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পর তা আদায় দেয়, তার যাকাত কবুল হয় না। কারণ, তার কাজ মহানবী ﷺ-এর নির্দেশ-বিরোধী। ইবনে আব্বাসের হাদীসে বর্ণিত, মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তা নামাযের পূর্বে আদায় দেয় তার যাকাত কবুল হয়। আর যে তা নামাযের পরে আদায় দেয়, তার সে যাকাত সাধারণ দান বলে গণ্য

হয়।” *(সআদাঃ ১৪২০, ইমাঃ ১৮২৭, হাঃ ১/৪০৯, বাঃ ৪/১৬৩)*

অবশ্য কোন অসুবিধার জন্য নামাযের পর দিলে তার যাকাত কবুল হয়ে যাবে। যেমন, যদি কেউ ঈদের সকালে এমন জায়গায় থাকে, যেখানে যাকাত নেওয়ার মত লোক নেই, অথবা সকালে হঠাৎ করে ঈদের খবর এলে ফিতরা আদায় দেওয়ার সুযোগ না পেলে, অথবা অপর কাউকে তা আদায় দেওয়ার ভার দেওয়ার পর সে তা ভুলে গেলে ঈদের নামাযের পর তা আদায় দিলে দোষাবহ নয়। যেহেতু এ ব্যাপারে তার ওজর গ্রহণযোগ্য।

v যাকাত কোথায় দিতে হবে?

যাকাত আদায় করার সময় মুসলিম যে জায়গায় থাকে, সে জায়গার দরিদ্র মানুষদের মাঝে বিতরণ করতে হবে।

v যাকাতের হকদার ও বন্টন-পদ্ধতি

ফিতরার যাকাতের হকদার হল গরীব মানুষরা এবং সেই ঋণগ্রস্ত মানুষরা, যারা তাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না। এই শ্রেণীর মানুষদেরকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যাকাত দেওয়া যাবে।

একটি ফিতরা কয়েকটি মিসকীনকে দেওয়া চলবে। যেমন কয়েকটি ফিতরা দেওয়া চলবে একটি মাত্র মিসকীনকে। যেহেতু মহানবী ﷺ কত দিতে হবে তা নির্ধারণ করেছেন; কিন্তু কয়জন মিসকীনকে দিতে হবে, তা নির্ধারণ করেন নি।

খুশীর ঈদ

মহান আল্লাহ প্রত্যেক বছরে মুসলিমদেরকে দুটি খুশীর দিন দান করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যে দুটি দিনে তারা সেই নিয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে খুশীর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে, যা তিনি তাদেরকে প্রদান করেছেন। সুতরাং ঈদুল ফিত্বরে মুসলিমরা নিজ নিজ রোযা সমাপ্ত করে এবং রমযানের কিয়াম (রাতের নামায) আদায়ে আল্লাহর তওফীক লাভ করার ফলে খুশী প্রকাশ করে থাকে। আর ঈদুল আযহাতে তাদের হজ্জ ও কুরবানী নিয়ে আনন্দ উপভোগ করে থাকে এবং তাদের বিগত ইতিহাস স্মরণ করে থাকে। যার ফলে তারা বেশী বেশী করে সৎকর্ম করে থাকে এবং নানা ধরনের কুরবানী পেশ করে থাকে।

ঈদ মানে ফিরে আসা। যেহেতু খুশীর বার্তা নিয়ে ঈদ প্রতি বছর বারবার ফিরে আসে এবং মানুষ তা বারবার পালন করে, তাই তাকে ঈদ বলা হয়। অনেকে বলেন, যেহেতু তা প্রত্যেক বছর নতুনভাবে খুশী নিয়ে ফিরে আসে, তাই তাকে ঈদ বলে। কেউ কেউ বলেন, যে ব্যক্তি ঈদের খুশী অনুভব করে, আগামীতে তার কাছে আবার ফিরে আসুক এই আশাবাদিতার কারণে তাকে ঈদ বলা হয়েছে।

v ঈদ দুটি; যার কোন তৃতীয় নেই

এ কথা বিদিত যে, ইসলামের ঈদ মাত্র দুটি; যার কোন তৃতীয় নেই ঃ ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহা। এ দুটি ঈদ প্রত্যেক বছর

আমাদের নিকট ঘুরে-ফিরে আগমন করে থাকে। অবশ্য তৃতীয় আর একটি ঈদ আছে যা সপ্তাহান্তে একবার ফিরে আসে, আর তা হল জুমআর দিন। এ ছাড়া মুসলিমদের জন্য আর অন্য কোন ঈদ নেই। যেমন যে ঈদ বদর অথবা মক্কা-বিজয় যুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার উপলক্ষ্যে পালন করা হয়ে থাকে; যাতে মুসলিমরা চমৎকার বিজয় লাভ করেছিল - সে ঈদ শরয়ী ঈদ নয়।

বলা বাহুল্য, উক্ত তিন ঈদ ছাড়া অন্য ঈদ আল্লাহর দ্বীনে নব আবিষ্কৃত বিদআত; যার সপক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং মহানবী ﷺ উম্মতের জন্য তা বিধিবদ্ধ করে যাননি। সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত ঈদ ছাড়া অন্য ঈদ বিধেয় হওয়ার দাবী করে, সে আসলে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে এবং রসূলের নামে মিথ্যা বলে। *(মুহাল্লা ৫/৮১, মুমঃ ৫/১)*

v বিদআতী ঈদ

যখন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, মুসলিমদের ঈদ কেবল তিনটি, তখন এ কথা পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, উক্ত তিন ঈদ-পর্ব ছাড়া অন্য যে কোন পর্বের জন্য ঈদ নাম প্রয়োগ করা হয়, তা আসলে বিদআতী ঈদ। যেমন ঈদে নওরোজ, ঈদে মাহারজান, ঈদে ক্রিসমাস, ঈদে মীলাদুন্নাবী, ঈদে শাম্মুন নাসীম (বসন্তোৎসব), ঈদে উম্ম্ (মাতৃদিবস), ঈদুল উসরাহ (পরিবার দিবস) ইত্যাদি। সুতরাং উক্ত সকল ঈদ পালন করা, যারা পালন করে তাদের খুশীতে অংশগ্রহণ করা অথবা সে উপলক্ষ্যে তাদেরকে মুবারকবাদ জানানো মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়। যেহেতু এ সকল ঈদ হল

বিদআতী অথবা রহিত ঈদ। বরং এর কিছু কুফরী ঈদ; যেমন ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান প্রভৃতি কাফেরদের সকল ঈদ।

v ঈদের যৌক্তিকতা

মহান আল্লাহ মহান উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য ঈদ বিধিবদ্ধ করেছেন। মানুষ যখন রোযার মত ইসলামের একটি ফরয পালন করল, তখন তার পরেই তিনি তাদের জন্য একটি ঈদের দিন দান করলেন, যাতে তারা খুশী করতে পারে। সেদিন তারা আনন্দ উপভোগ করতে পারে, বৈধ খেলা খেলতে পারে এবং তারই মাঝে ঈদের খুশীর বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। আল্লাহর দেওয়া উক্ত নিয়ামতের শুক্‌র আদায় হতে পারে।

এই ঈদে তারা খুশী হয়, কারণ রোযা পালনের মাধ্যমে স্বকৃত পাপরাশি থেকে তারা পবিত্র হতে পারে। মহান আল্লাহ রোযার শেষে একটি দিন ঈদস্বরূপ মুসলিমদেরকে উপহার দিলেন, যাতে তারা ইবাদতের এই মৌসমের পর পাপরাশি মাফ হওয়া, মর্যাদা সমুচ্চ হওয়া এবং নেকীর ভান্ডার বৃদ্ধি পাওয়ার নিয়ামত নিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে পারে। *(মুমঃ ৫/২১১)*

v ঈদের নামাযের মান ঃ

ঈদের খুশীর প্রধান অঙ্গ হল, ঈদের নামায। এই নামায বিধিবদ্ধ হয় হিজরীর প্রথম সনেই। মহানবী ﷺ মদীনায় আগমন করলে দেখলেন, মদীনাবাসীরা দুটি ঈদ পালন করছে। তা দেখে তিনি বললেন, (জাহেলিয়াতে) তোমাদের দুটি দিন ছিল যাতে তোমরা

খেলাধূলা করতে। এক্ষণে ঐ দিনের পরিবর্তে আল্লাহ তোমাদেরকে দুটি উত্তম দিন প্রদান করেছেন; ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিন।’ *(সআদাঃ ১০০৪, নাঃ ১৫৫৫নং)*

বলা বাহুল্য, এ নামায কিতাব, সুন্নাহ ও মুসলিমদের ইজমা’ মতে বিধেয়। *(মুগনী ৩/২৫৩)*

এ নামায ২ রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। মহানবী ﷺ তাঁর জীবনের প্রত্যেক ঈদেই এ নামায আদায় করেছেন এবং পুরুষ ও মহিলা সকলকেই এ নামায আদায় করার জন্য (ঈদগাহে) বের হতে আদেশ করেছেন। *(ফিসুঃ ১/২৭৭, তাইরাঃ ৩৩পৃঃ)* তাঁর পর তাঁর খুলাফারাও এ নামায যথারীতি আদায় করেছেন।

তালহা বিন উবাইদুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত যে, একদা এক বেদুঈন মহানবী ﷺ-কে ফরয নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে ৫ অক্ত্ নামাযের কথা শিক্ষা দিলেন। অতঃপর বেদুঈন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, এ ছাড়া কি আমার উপর অন্য কিছু ফরয আছে? উত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, “না, অবশ্য তুমি যদি নফল হিসাবে পড়, (তাহলে সে কথা আলাদা।)” *(বুঃ ৪৬, মুঃ ১১নং)*

পক্ষান্তরে বহু সত্যানুসন্ধানী উলামা মনে করেন যে, ঈদের নামায ওয়াজেব; কোন ওযর ছাড়া তা মাফ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ তাঁর জীবনে প্রত্যেকটি ঈদে এ নামায আদায় করেছেন এবং কোন ঈদেই তা ত্যাগ করেন নি। মহিলাদেরকে এ নামায আদায় করার লক্ষ্যে ঘর থেকে ঈদগাহে বের হতে আদেশ করেছেন। আর আদেশ করার মানেই হল তা ওয়াজেব। তাছাড়া ঈদের নামায হল ইসলামের

অন্যতম প্রতীক। আর দ্বীনের প্রতীক ওয়াজেব ছাড়া আর কি হতে পারে? যেমন ঈদ ও জুমআহ একই দিনে একত্রিত হলে এবং ঈদের নামায আদায় করলে আর জুমআহ না পড়লেও চলে। আর এ কথা বিদিত যে, কোন নফল আমল কোন ফরয আমলকে গুরুত্বহীন করতে পারে না। *(দ্রঃ = মাফাঃ ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৩/ ১৬১, কিসাঃ ইবনুল কাইয়্যেম ১১পৃঃ, নাআঃ ৩/৩১০-৩১১, মুমঃ ৫/ ১৫১, তামিঃ ৩৪৪পৃঃ, ফাসিঃ মুসনিদ ১১৬পৃঃ)*

v ঈদের নামাযের সময়

ঈদের নামাযের সময় শুরু হয় ঈদের দিনের সূর্য উদয় হওয়ার মোটামুটি ১৫ মিনিট পর এবং শেষ হয় যোহরের নামাযের সময় উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে। *(মুমঃ ৫/ ১৫৪)*

ইবনে কুদামাহ বলেন, ঈদুল আযহার নামায সকাল সকাল পড়া সুন্নত; যাতে কুরবানী করতে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় এবং ঈদুল ফিত্বরের নামায একটু দেরী করে পড়া সুন্নত; যাতে তার পূর্বে ফিত্বরার সদকা বের করার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে থাকে। *(আল-মুগনী ৫/২৬৭)*

v ঈদের নামাযের স্থান

শহরের বাইরে কোন নিকটবর্তী প্রশস্ত ময়দানে ঈদের নামায আদায় করা সুন্নত; যাতে লোকেদের জন্য সেখানে উপস্থিত হওয়া সহজ হয়। আবূ সাঈদ খুদরী ﵁ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ ঈদুল ফিত্বর ও আযহার দিন মুসাল্লায় বের হয়ে যেতেন। *(বুখারী ৯৫৬নং)*

v ঈদগাহে বের হওয়ার নানা আদব ঃ

মহানবী ﷺ ঈদের দিনে পালনীয় বিভিন্ন সুন্নাহ ও আদব আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা সংক্ষেপে তার কিছু তুলে ধরছি ঃ-

v ঈদের জন্য গোসল করা ঃ

ঈদের নামাযের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। ইবনে উমার رضي الله عنه থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি ঈদুল ফিত্বরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন। *(মাঃ ৪২৮-নং)*

সাঈদ বিন মুসাইয়াব থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'ঈদুল ফিত্বরের সুন্নত হল ৩টি; পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া, যাওয়ার আগে কিছু খাওয়া এবং গোসল করা।' *(ইগঃ ৩/১০৪)* আর সম্ভবতঃ তিনি এ সুন্নত ৩টি কোন কোন সাহাবা থেকে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম নাওয়াবী ঈদের নামাযের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে উলামাগণ একমত আছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া যে অর্থে জুমআহ ইত্যাদি সাধারণ সমাবেশের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব, সেই অর্থ ঈদেও বর্তমান। বরং সেই অর্থ ঈদে অধিকতর স্পষ্ট। *(দুরাঃ ৯৭পৃঃ)*

v ঈদের জন্য সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার ঃ

সহীহ বুখারীতে 'ঈদ ও তার জন্য সাজসজ্জা গ্রহণ'-এর বাবে বর্ণিত আষারে আব্দুল্লাহ বিন উমার رضي الله عنه বলেন, একদা উমার رضي الله عنه

একটি মোটা রেশমের তৈরী জুব্বা বাজারে বিক্রয় হতে দেখে তিনি তা নিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এটা ক্রয় করে নিন। এটি ঈদ ও বহিরাগত রাজ-প্রতিনিধিদের জন্য পরিধান করে সৌন্দর্য ধারণ করবেন।' কিন্তু তিনি বললেন, "এটি তো তাদের লেবাস, যাদের (পরকালে) কোন অংশ নেই।" *(বুঃ ৯৪৮-নং)*

ইবনে কুদামাহ বলেন, এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, উক্ত সময়ে সৌন্দর্য ধারণ করা তাঁদের নিকট প্রচলিত ছিল। *(মুগঃ ৩/২৫৭)* উক্ত ঘটনায় আল্লাহর রসূল ﷺ সৌন্দর্য ধারণের ব্যাপারে আপত্তি জানালেন না। কিন্তু তা ক্রয় করতে আপত্তি জানালেন; কেননা তা ছিল রেশমের তৈরী। *(দুরাঃ ৯৯পৃঃ)*

ত্বাবারানীতে ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ ঈদের দিনে একটি লাল রঙের চেক-কাটা চাদর পরতেন। *(সিসঃ ১২৭৯নং দ্রঃ)*

ইবনে উমার ﷺ ঈদের জন্য তাঁর সবচেয়ে বেশী সুন্দর লেবাসটি পরিধান করতেন। *(বাঃ ৩/২৮১)*

আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ উভয় ঈদে তাঁর সব চাইতে বেশী সুন্দর পোশাকটি পরিধান করতেন। *(বাঃ, ফবাঃ ২/৫১০)*

ইমাম মালেক বলেন, 'আমি আহলে ইল্‌মদের কাছে শুনেছি, তাঁরা প্রত্যেক ঈদে সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহারকে মুস্তাহাব মনে করতেন।'

সুতরাং পুরুষের জন্য উচিত হল, ঈদের নামাযের জন্য বের

হওয়ার আগে তার সব চাইতে সুন্দর পোশাকটি পরিধান করবে। অবশ্য মহিলারা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় (ভিতর বাহিরের) সর্বপ্রকার সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে দূরে থাকবে। যেহেতু বেগানা পুরুষের সম্মুখে মহিলার সৌন্দর্য প্রকাশ করা হারাম। অনুরূপ হারাম - ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কোন প্রকার সেন্ট, পারফিউম, আতর বা সুগন্ধময় ক্রিম-পাউডার অথবা অন্য কোন প্রসাধন ব্যবহার। যেমন, বাইরে বের হয়ে তার চলনে, বলনে, ভাবে, ভঙ্গিমায় যেন-তেন প্রকারে কোন পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করাও বৈধ নয়। যেহেতু সে তো সে সময় কেবল মহান আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করার উদ্দেশ্যেই বের হয়। তাহলে যে মুমিন মহিলা তাঁর আনুগত্যে সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে আবার তাঁরই নাফরমানি করে টাইটফিট্ বা চুস্ত্ অথবা দৃষ্টি-আকর্ষক রঙিন পোশাক পরিধান করে কি করে অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হয় কিভাবে? *(দুরাঃ ৯৯- ১০০পৃঃ)*

v শিশু ও মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়া ঃ

শিশু ও মহিলার জন্যও ঈদগাহে যাওয়া বিধেয়। চাহে মহিলা কুমারী হোক অথবা অকুমারী, যুবতী হোক অথবা বৃদ্ধা, পবিত্রা হোক অথবা ঋতুমতী। উম্মে আত্বিয়্যাহ বলেন, 'আমাদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন মহিলাদেরকে উভয় ঈদে (ঘর থেকে ঈদগাহে) বের করি। তবে ঋতুমতী মহিলা নামাযের স্থান থেকে দূরে থাকবে। তারা অন্যান্য মঙ্গল ও মুসলিমদের দুআর জন্য উপস্থিত হবে। তারা পুরুষদের পিছনে

অবস্থান করবে। পুরুষদের সাথে তারাও (নিঃশব্দে) তকবীর পাঠ করবে।'

তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো কারো চাদর না থাকলে?' উত্তরে তিনি বললেন, "তার কোন বোন তাকে নিজ (অতিরিক্ত অথবা পরিহিত বড়) চাদর পরতে দেবে।" *(বুঃ ৩২৪, ৯৭৪, মুঃ ৮৯০নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ কন্যা ও স্ত্রীদেরকে উভয় ঈদে ঈদগাহে বের হতে আদেশ করতেন।' *(আঃ ১/২৩১, ইআশাঃ প্রমুখ, সিসঃ ২১১৫, সজাঃ ৪৮৮৮নং)*

বিদিত যে, ঈদগাহে বের হলে মহিলাদের জন্য পর্দা গ্রহণ করা ওয়াজেব। বেপর্দা হয়ে, সেন্ট বা আতর ব্যবহার করে, পুরুষদের দৃষ্টি-আকর্ষী সাজ-সজ্জা করে বের হওয়া বৈধ নয়। বৈধ নয় পুরুষদের পাশাপাশি চলা, তাদের ভিঁড়ে প্রবেশ করা।

বলা বাহুল্য, পরবর্তী যুগে মহিলা দ্বারা নানা ফাসাদ ও অঘটন ঘটার ফলে যাঁরা তাদেরকে ঈদগাহে যেতে বাধা দেন বা অবৈধ মনে করেন, তাঁদের মত সঠিক নয়। অবশ্য যদি তাঁরা কেবল বেপর্দা মহিলা এবং পর্দায় ঢিল মারে এমন মহিলাদের ক্ষেত্রে ঐ বাধা প্রয়োগ করেন, তাহলে তা সঠিক বলে সকলে মেনে নেবে। *(আআসাঈঃ ২৬পৃঃ, মাবাঃ ১৩৬/২৫)* পক্ষান্তরে পর্দানশীন মহিলা সহ সকল মহিলার জন্য ঐ বাধা ব্যাপক করা শুদ্ধ নয়। কারণ, মহানবী ﷺ তাদেরকে বের হতে আদেশ করেছেন। এমন কি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেছেন, 'মহিলাদের জন্য

ঈদগাহে বের হওয়া ওয়াজেবও বলা যেতে পারে।' *(ইফিঃ ৮২পৃঃ, মাবাঃ ১৩৬/২৫)*

অতএব স্পষ্ট যে, ঈদের নামায আদায়ের জন্য মহিলাদের মসজিদে অথবা কোন ঘরে জমায়েত হয়ে পৃথকভাবে জামাআত করা এবং মুসলিমদের সাধারণ জামাআতের সাথে তাদের বের না হওয়া মহানবী ﷺ-এর আদেশের পরিপন্থী কাজ। উচিত হল, মহিলাদেরকে পর্দা করা এবং ঈদগাহেও পর্দার ব্যবস্থা করা।

v ঈদের নামাযের জন্য বের হওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়াঃ

ঈদগাহের জন্য বের হওয়ার পূর্বে ৩ অথবা ৫ বেজোড় সংখ্যক খেজুর খাওয়া মুস্তাহাব। আনাস رضي الله عنه বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেজুর না খেয়ে বের হতেন না।' এক বর্ণনায় আছে যে, 'তিনি তা বেজোড় সংখ্যক খেতেন।' *(বুঃ ৯৫৩, ইমাঃ ১৭৫৪, ইখুঃ ১৪২৯নং)*

এই খাওয়ার পিছনে হিকমত হল, যাতে কেউ মনে না করে যে, ঈদের নামায পর্যন্ত রোযা রাখতে হয়। আর এতে রয়েছে রোযা ভেঙ্গে সত্বর মহান আল্লাহর হুকুম পালন। *(ফবাঃ ২/৫১৮)*

কোন কোন উলামা মনে করেন যে, যদি কেউ ফজর উদয় হওয়ার পরে এবং ফজরের নামায পড়ার আগেও খেয়ে নেয়, তাহলে উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে। কারণ, সে অবস্থায় সে দিনের বেলায় খেয়েছে বলেই বিবেচিত হবে। অবশ্য উত্তম হল, ঈদগাহে বের হওয়ার অব্যবহিত পূর্বেই তা খাওয়া। *(মুমঃ ৫/১৬১)*

প্রকাশ থাকে যে, খেজুর না পাওয়া গেলে যে কোন খাবার খেলেই যথেষ্ট হবে।

v পায়ে হেঁটে যাওয়া ঃ

পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া মুস্তাহাব। ইবনে উমার ও অন্যান্য সাহাবা ﵃ কর্তৃক বর্ণিত যে, মহানবী ﷺ পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যেতেন এবং পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরতেন। *(সইমাঃ ১০৭০, ১০৭১, ১০৭৩নং)*

আলী ؓ বলেন, 'একটি সুন্নত হল, পায়ে হেঁটে ঈদগাহ যাওয়া।' *(তিঃ ৫৩০, সইমাঃ ১০৭২, বাঃ ৩/২৮১)*

এ ছাড়া সাঈদ বিন মুসাইয়েবের উক্তি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে; তিনি বলেছেন, 'ঈদুল ফিত্বরের সুন্নত হল ৩টি; পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া, যাওয়ার আগে কিছু খাওয়া এবং গোসল করা।' *(ইগঃ ৩/১০৪)* যুহরী বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ কখনো জানাযায় অথবা ঈদুল ফিতরে অথবা ঈদুল আযহায় সওয়ার হয়ে যান নি।' *(ঐ ৩/১০৩)* ইমাম আহমাদ বলেন, 'আমরা হেঁটে যাই, আমাদের ঈদগাহ নিকটে। দূরে হলে সওয়ার হয়ে যাওয়ায় দোষ নেই।' *(মুগনী ২/৩৭৪)*

v ঈদের দিন তকবীর পাঠ ঃ

শেষ রোযার দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে ঈদের নামায শুরু হওয়া পর্যন্ত তকবীর পাঠ করা বিধেয়। এর দলীল মহান আল্লাহর স্পষ্ট বাণী ঃ

((وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ))

অর্থাৎ, যেন তোমরা নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন তার জন্য তোমরা আল্লাহর তকবীর পাঠ কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। *(কুঃ ২/ ১৮৫)*

কোন কোন উলামা বলেন, এই তকবীর পাঠ করা ওয়াজেব। অবশ্য তা একবার পাঠ করলেই ওয়াজেব পালনে যথেষ্ট হবে। *(মুহাল্লাঃ ৫/৮৯)*

এই তকবীর আল্লাহর তা'যীম ঘোষণা এবং তাঁর ইবাদত ও শুকরিয়া প্রকাশের উদ্দেশ্যে পুরুষের জন্য মসজিদে, ঘরে, বাজারে ও রাস্তা-ঘাটে উচ্চস্বরে পাঠ করা সুন্নত। সলফদের নিকট ঈদগাহের প্রতি বের হওয়া থেকে শুরু করে ইমাম আসার আগে পর্যন্ত উক্ত তকবীর পাঠ করার কথা অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। এ কথা সলফদের আমল বর্ণনাকারী এক জামাআত গ্রন্থকার; যেমন ইবনে আবী শাইবাহ, আব্দুর রায্যাক ও ফিরয়াবী তাঁদের এ আমল নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর মহানবী ﷺ কর্তৃকও এ কথা সরাসরিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। *(ইগঃ ৩/ ১২১-১২৩, আল্লামা আলবানী এ ব্যাপারে মারফূ' ও মাওকূফ উভয় সূত্রকে সহীহ বলেছেন।)*

মহানবী ﷺ উচ্চস্বরে তকবীর পাঠ করতে করতে উভয় ঈদে বের হতেন। *(সজাঃ ৪৯৩৪নং)*

v তকবীরের শব্দাবলী ঃ

ইবনে মাসঊদ رضي الله عنه তকবীর পাঠ করে বলতেন,

اللهُ أَكْبَر، اَللهُ أَكْبَر، لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَالله أَكْبَر، اَلله أَكْبَر، وَلله الْحَمْد.

'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার অলিল্লাহিল হাম্‌দ।' *(ইআশাঃ ৫৬৫০, ৫৬৫২নং, ইগঃ ৩/১২৫)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলতেন,

اللهُ أَكْبَر، اَللهُ أَكْبَر، اَلله أَكْبَر، وَلله الْحَمْد، اَللهُ أَكْبَر وَأَجَلُّ،

اَلله أَكْبَر عَلىَ مَا هَدَانَا.

'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, অলিল্লাহিল হাম্‌দ। আল্লা-হু আকবার অ আজাল্ল, আল্লাহু আকবার আলা মা হাদা-না।' *(বাঃ ৩/৩১৫, ইগঃ ৩/১২৫)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

اللهُ أَكْبَر كَبِيْراً، اَلله أَكْبَر كَبِيْراً، اَللهُ أَكْبَر وَأَجَلُّ، اَلله أَكْبَر،

وَلله الْحَمْد.

'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, আল্লা-হু আকবার কাবীরা, আল্লা-হু আকবার অ আজাল্ল, আল্লাহু আকবার, অলিল্লাহিল হাম্‌দ।' *(ইআশাঃ ৫৬৪৫, ৫৬৫৪, ইগঃ ৩/১২৫)*

মহিলারাও এই তকবীর পাঠ করবে, তবে নিম্নস্বরে। যাতে গায়র মাহরাম কোন পুরুষ তার এই তকবীর পাঠের শব্দ না শুনতে পায়। উম্মে আত্বিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, '--- এমনকি আমরা ঋতুমতী মহিলাদেরকেও ঈদগাহে বের করতাম। তারা পুরুষদের পিছনে অবস্থান করত; তাদের তকবীর পড়া শুনে তারাও তকবীর পাঠ

করত এবং তাদের দুআ শুনে তারাও দুআ করত। তারা ঐ দিনের বর্কত ও পবিত্রতা আশা করত।’ *(বুঃ ৯৭১, মুঃ ৮৯০নং)*

পক্ষান্তরে সমবেত কণ্ঠে সমস্বরে জামাআতী তকবীর অথবা একজন বলার পর অন্য সকলের একই সাথে তকবীর পাঠ বিদআত। যেহেতু যিক্র-আযকারে মহানবী ﷺ-এর আদর্শ হল, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ যিক্র একাকী পাঠ করবে। সুতরাং তাঁর ও তাঁর সাহাবাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া কারো জন্য উচিত নয়। *(আআসাঈঃ ৩১-৩২পৃঃ)*

۞ ঈদগাহে যাওয়ার জন্য এক পথ এবং সেখান হতে ফিরার জন্য অন্য পথ অবলম্বন করা সুন্নত। জাবের ؓ বলেন, ‘ঈদের দিন হলে তিনি রাস্তা পরিবর্তন করতেন।’ *(বুঃ ৯৮৬নং)*

۞ ঈদের খুশী পরিপূর্ণরূপে প্রকাশের উদ্দেশ্যে পরিবার-পরিজনের জন্য পান-ভোজন ও লেবাস-পোশাকে প্রশস্ততা প্রদর্শন করা উত্তম। অবশ্য তাতে যেন অপচয় ও অপব্যয় না থাকে। অনুরূপভাবে আত্মীয়-স্বজন ও ভাই-ব্রাদারকে দেখা-সাক্ষাৎ করাও উত্তম। তবে এই ক্ষেত্রে যেন আল্লাহর হারামকৃত বস্তু থেকে দৃষ্টি অবনত রাখা হয় এবং নারী-পুরুষের অবৈধ অবাধ মেলামিশা থেকে অবশ্যই দূরে থাকা হয়।

ঈদ সংক্রান্ত কিছু বিরুদ্ধ আচরণ

কিছু লোক এই খুশীর দিনে এমন কিছু ভুল ইবাদত ও আচরণে পতিত হয়, যা আসলে মহানবী ﷺ কর্তৃক অনুমোদিত নয়। অথচ তারা ভাবে এ কাজে সওয়াব আছে অথবা তার মাধ্যমে আল্লাহর

নৈকট্য লাভ হবে। যেমন ঃ-

১। অনেকে মনে করে ঈদের রাত নামাযের মাধ্যমে জাগরণ করা বিধেয়। আর এ প্রসঙ্গে তারা যে হাদীস বর্ণনা করে থাকে, তা সহীহ নয়। "যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাত আল্লাহর উদ্দেশ্যে সওয়াবের জন্য নামাযের মাধ্যমে জাগরণ করবে, সে ব্যক্তির হৃদয় সেদিন মারা যাবে না যেদিন সমস্ত হৃদয় মারা যাবে।" এ হাদীস অতিশয় দুর্বল। অতএব অন্যান্য রাত্রের মধ্যে কেবল ঈদের রাতকে নামায দ্বারা নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে যার প্রত্যেক রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস আছে, সে ব্যক্তির ঐ রাতে নামায পড়া দোষাবহ নয়।

২। অনেকে ঈদের রাত্রি এমনিই জাগরণ করে এবং তার ফলে শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে গিয়ে তাদের ফজরের নামায বরং অনেক সময় ঈদের নামাযও ছুটে যায়।

৩। ঈদগাহ বা অন্য স্থলে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামিশা, যুবক-যুবতীর প্রতিযোগিতার খেলা। মহিলাদের সাজসজ্জা করে, বেপর্দা হয়ে এবং সেন্ট ব্যবহার করে ঈদগাহে বা বেড়াতে বের হওয়া।

৪। ঈদের দিন খুশী পালন করতে গিয়ে গান-বাজনা শোনা, অবৈধ খেলা খেলা বা অবৈধ ফিল্ম্ দেখা। অথচ তা ঈদের দিন এবং অন্যান্য দিনেও হারাম। আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল করার জন্য ঈদকে উপলক্ষ্য বানানো বৈধ নয়। আসলে ঈদ হল আল্লাহর শুক্র্ আদায় ও তার অনুগ্রহ পেয়ে খুশী করার উপযুক্ত সময়।

৫। কিছু লোক আছে যারা ঈদের দিন এই জন্য খুশী প্রকাশ করে যে, রমযান চলে গেছে এবং রোযা শেষ হয়ে গেছে। অথচ এটি ভুল

আচরণ। যেহেতু মুসলিমরা ঈদ পেয়ে এ জন্য খুশী হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে রমযান মাস ও তার রোযা পূর্ণ করার তওফীক দিয়েছেন। এ খুশী রোযা শেষ করার জন্য নয়; যা কিছু লোক নিজেদের উপর ভারী বোঝা মনে করে থাকে।

৬। কিছু লোক ঈদের দিনকে কবর যিয়ারত ও মৃতব্যক্তিদের কল্যাণ উদ্দেশ্যে দুআ করার জন্য নির্দিষ্ট করে। অথচ তা বিদআত।

৭। অনেকে এ দিনে অপব্যয় ও অপচয় করে থাকে। অথচ বৈধ বিষয়েও তা করা বৈধ নয়।

v খুতবা শোনার গুরুত্ব ঃ

ঈদের খুতবা দেওয়া ও শোনা (জুমআর খুতবার মত ওয়াজেব নয়; বরং তা) সুন্নত। আব্দুল্লাহ বিন সায়েব বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলাম। নামায শেষ করে তিনি বললেন, "আমরা খুতবা দেব; সুতরাং যে ব্যক্তি খুতবা শোনার জন্য বসতে পছন্দ করে সে বসে যাক্। আর যে ব্যক্তি চলে যেতে পছন্দ করে সে চলে যাক্।" *(সআদাঃ ১০২৪, সইমাঃ ১০৬৬, হাঃ ১/২৯৫, ইখুঃ ১৪৬২, ইগঃ ৬২৯, সজাঃ ২২৮৯নং, তামিঃ ৩৫০পৃঃ)*

অবশ্য মুমিনের জন্য উচিত এই যে, প্রত্যেক মঙ্গলের প্রতি সে আগ্রহী হবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য উপকারী বিষয়ের প্রতি যত্নবান হবে। আর খুতবা শোনা নিশ্চয় বড় উপকারী বিষয়।

v ঈদের মুবারকবাদ ঃ

ঈদে একে অপরকে মুবারকবাদ দেওয়া ঈদের অন্যতম আদব ও

বৈশিষ্ট্য। এর ফলে মুসলিমদের মাঝে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ঈদগাহে, রাস্তায় বা বাজারে যেখানেই আপোসের সাক্ষাৎ হয় সেখানেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা লাভের আশায় পরস্পর মুসাফাহা করা বিধেয়।

এই মুবারকবাদ সাহাবা ﷺ-দের যুগে প্রচলিত ও পরিচিত ছিল। জুবাইর বিন নুফাইর বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবাগণ ঈদের দিন একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ হলে বলতেন, 'তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না অমিন্ক।' *(ফবাঃ ২/৫১৭, তামিঃ ৩৫৪-৩৫৫পৃঃ)*

মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ আলহানী বলেন, আমি আবু উমামা বাহেলী ﷺ ও নবী ﷺ-এর অন্যান্য সাহাবাগণের সাথে ছিলাম। তাঁরা যখনই (ঈদের নামায পড়ে) ফিরে আসতেন, তখনই একে অপরকে বলতেন, 'তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না অমিন্ক।' *(যাইল বাঃ ৩/৩২০)*

এ ছাড়া 'ঈদ মুবারক' ইত্যাদি বলে প্রচলিত যে কোন বৈধ শব্দে মুবারকবাদ পেশ করা বৈধ।

সাহাবাদের মাঝে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে অথবা কোন খুশীর সময় একে অপরকে মুবারকবাদ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। যেমন আল্লাহ কারো তওবা কবুল করলে তাঁরা তাকে মুবারকবাদ জানিয়েছেন। সাহাবা কর্তৃক যে সকল বর্ণনা দলীলস্বরূপ উদ্ধৃত করা হয়, তা হতে বুঝা যায় ঈদ উপলক্ষ্যে এই মুবারকবাদের প্রথা নিন্দনীয় নয়। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুবারকবাদ জানানো সচ্চরিত্রতার অন্যতম আচরণ এবং মুসলিমদের মাঝে সুন্দর সামাজিকতার বহিঃপ্রকাশ।

ঈদের অন্যান্য আহকাম

১। ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। আবূ সাঈদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ দুদিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন; ঈদুল ফিত্বর ও কুরবানীর দিন। *(বুখারী, মুসলিম)*

২। ঈদের নামাযের জন্য আযান নেই, ইকামতও নেই। জাবের বিন সামুরাহ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে একাধিক বার দুই ঈদের নামায বিনা আযান ও ইকামতে পড়েছি। *(মুসলিম ৮৮৭নং)*

ইবনুল কাইয়েম বলেন, নবী ﷺ যখন ঈদগাহে পৌঁছতেন, তখন বিনা আযান ও ইকামতে নামায শুরু করতেন। এ ক্ষেত্রে 'আস্-স্বালাতু জামিআহ'ও বলতেন না। সুতরাং সুন্নত হল এ সবের কিছু না বলা। *(যাদুল মাআদ ১/৪৪২)*

৩। ঈদের নামাযের পূর্বে ও পরে কোন সুন্নত নামায নেই। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ ঈদুল ফিত্বরের দিন ২ রাকআত নামায পড়লেন এবং তার আগে ও পরে কোন নামায পড়েননি। *(বুখারী ৯৬৪নং)*

অবশ্য ঈদের নামায মসজিদে হলে প্রবেশ করে ২ রাকআত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায না পড়ে বসবে না। আবূ কাতাদাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদ প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে ২ রাকআত নামায পড়ে নেয়।" *(বুঃ ৪৪৪, মুঃ ৭১৪নং প্রমুখ)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, "সে

যেন ২ রাকআত নামায পড়ার পূর্বে না বসে।” *(বুঃ ১১৬৭, মুঃ ৭১৪নং প্রমুখ)*

৪। নামাযের শুরুতে প্রাথমিক তকবীর চলা অবস্থায় কেউ জামাআতে শামিল হলে এবং কিছু তকবীর ছুটে গেলে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে যে কয়টি তকবীর ইমামের সাথে পায় তা বলবে এবং বাকী যা ছুটে গেছে তা মাফ হয়ে যাবে।

৫। এক রাকআত ছুটে গেলে তা কাযা করে নেবে এবং ইমাম দ্বিতীয় রাকআতে যা করেন সেও তাতে তাই করবে।

৬। ইমামকে তাশাহহুদ অবস্থায় পেলে তাঁর সাথে বসে যাবে। অতঃপর সালাম ফিরা হলে উঠে গিয়ে ২ রাকআত নামায আদায় করে নেবে এবং তাতে যথানিয়মে অতিরিক্ত তকবীর পাঠ করবে।

৭। ইমামের সাথে পুরো নামাযটাই কারো ছুটে গেলে যোহরের আগে আগে অনুরূপভাবে অনুরূপ সংখ্যক তকবীর ইত্যাদির সাথে যথানিয়মে কাযা করে নেবে। ইমাম বুখারী বলেন, ‘বাব ঃ কারো ঈদের নামায ছুটে গেলে ২ রাকআত নামায পড়ে নেবে। তদনুরূপ মহিলা এবং যারা ঘরে ও গ্রামে থেকে যায় তারাও। যেহেতু নবী ﷺ বলেন, “এ হল আমাদের ঈদ, হে মুসলিমগণ!” একদা আনাস বিন মালেক رضي الله عنه তাঁর স্বাধীনকৃত দাস ইবনে আবী উতবাহকে আদেশ করলেন, তিনি তাঁর পরিবার ও ছেলেদেরকে জমায়েত করে শহরবাসীদের মতই তকবীর দিয়ে নামায পড়লেন।’ *(বুঃ ১৯৫পৃঃ, ইআশাঃ ৫৮০২নং)*

৮। জুমআর দিন ঈদ হলে যে ব্যক্তি ঈদের নামায পড়বে, সে

ব্যক্তির জন্য জুমআহ আর ওয়াজেব থাকবে না। যায়দ বিন আরকাম ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ ঈদের নামায পড়লেন এবং জুমআহ না পড়ার অনুমতি দিলেন। তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি জুমআহ পড়তে চায় সে পড়বে।” *(সআদাঃ ৯৪৫, নাঃ ১৫৯২, ইমাঃ ১৩১০, ইখুঃ ১৪৬৪নং)*

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমাদের আজকের এই দিনে দুটি ঈদ সমবেত হয়েছে। সুতরাং যার ইচ্ছা তার জন্য জুমআহ থেকে ঈদের নামায যথেষ্ট। অবশ্য আমরা জুমআহ পড়ব।” *(সআদাঃ ৯৪৮, ইমাঃ ১৩১১নং)*

ঈদ সৎকর্মের মৌসম

ঈদ একটি সুন্দর উপলক্ষ্য। মুসলিমের উচিত, বিভিন্ন সৎকর্মের মাধ্যমে এর সদ্ব্যবহার করে নিজের নেকীর ব্যালেন্স্ বৃদ্ধি করে নেওয়া। এ দিনের সৎকর্ম সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ-

১। ঈদগাহে ঈদের নামায পড়ুন ও খুতবাহ শুনুন।

২। পিতামাতাকে খুশী করার কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করুন। আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করুন।

৩। প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও দ্বীনী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করে খুশী বিনিময় করুন।

৪। গরীব-দুঃখী ও এতীম-অনাথদেরকে আপনার ঈদের খুশীতে শরীক করুন।

৫। এই খুশীর মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করে দুটি বিবদমান ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মাঝে সন্ধি ও মিলন স্থাপন করার চেষ্টা করুন।

৬। বেশী বেশী আল্লাহর যিক্‌র ও কুরআন তেলাঅত করুন।

ইসলাম ঈদের দিন খুশী প্রকাশের জন্য ভালো খাওয়া-পরা বৈধ করেছে, কর্মজীবনের ব্যস্ততা ও কষ্ট থেকে বিশ্রাম ও বিরতি নিয়ে বৈধ খেলাধূলা করাকে বৈধ ঘোষণা করেছে। যার ফলে হৃদয়-শক্তি পুনঃসঞ্চারিত হয় এবং আল্লাহর সরল পথে একটানা চলার মাঝে পথ-মঞ্জিলে একটু জিরিয়ে নেওয়া হয়।

আর এসবে রয়েছে সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্বের চরম শক্তিশালী সামাজিক বন্ধনের নবীকরণ।

এসবে রয়েছে হৃদয়ের প্রশান্তি ও উৎফুল্লতা এবং দেহাঙ্গের বিরতি ও বিশ্রাম।

আপনি চিন্তা করে দেখতে পারেন, যখন আপনি আপনার সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরিধান করেন, যথাসাধ্য সৌন্দর্য প্রদর্শন করেন, সবচেয়ে ভালো সুগন্ধি ব্যবহার করেন, সবচেয়ে উত্তম আহার গ্রহণ করেন, পারিবারিক দেখা-সাক্ষাতে পরম আনন্দ উপভোগ করেন, প্রিয়পাত্র বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাক্ষাৎ করে উল্লসিত হন, তখন এ সকল কর্মের প্রত্যেকটির বিনিময়ে আপনি সওয়াবপ্রাপ্ত হন! আর এ হল কেবল এই ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য, বৈশিষ্ট্য ও ঔদার্য।

ঈদ কিন্তু অবৈধ খেল-তামাশা ও উদাসীনতায় সময় নষ্ট করার দিন নয়; যেমন অনেক লোক এ ধারণা করে থাকে। বরং ঈদ

বিধিবদ্ধ হয়েছে আল্লাহর যিক্র প্রতিষ্ঠা, বান্দার প্রতি তাঁর নেয়ামত প্রকাশ, তাতে তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য। মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে মাস পূর্ণ করার সাথে সাথে তাঁর তকবীর পাঠ ও শুকরিয়া আদায় করতে বলেছেন,

(وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)

অর্থাৎ, যেন তোমরা নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন তার জন্য তোমরা আল্লাহর তকবীর পাঠ কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। *(কুঃ ২/ ১৮৫)*

বলাই বাহুল্য যে, যে সত্তা বান্দাকে রোযা রাখার তওফীক দিয়ে ও তাতে সাহায্য করে, তাকে ক্ষমা করে দোযখ থেকে মুক্তি দান করার মাধ্যমে বড় অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা এই যে, বান্দা তাঁর যিক্র ও ইবাদত করবে এবং যথাযথভাবে তাঁকে ভয় করবে।

রমযান পাওয়া একটি নেয়ামত

মহান আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখে রমযান পাইয়ে দিয়েছেন, এটি আমাদের প্রতি তাঁর একটি বড় নেয়ামত।

এ মাস আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছে, যখন আমরা সুস্থ ও সবল আছি; পীড়িত ও দুর্বল নই। যখন আমরা অভাবমুক্ত; অভাবী ও কপর্দকশূন্য নই।

এই মাসে আমাদের প্রয়োজন আছে, আমরা বেশী বেশী দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আকুল আবেদন জানাবো। আমরা তাঁর সুন্দর প্রশংসা করব, কারণ তিনিই আমাদের মাঝে রমযান পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা আমাদের নিজস্ব শক্তিবলে এ মাসে উপনীত হতে সক্ষম ছিলাম না।

এই মাসের মুহূর্ত পাওয়ার জন্য কত মানুষের মন আশাধারী ছিল, কত লোকের সাধ ছিল রমযান পাওয়ার। কিন্তু তার পূর্বেই মৃত্যু তাদেরকে হামলা করে তাদের সকল আশা ও সাধকে অপূর্ণ করে দিয়েছে। প্রবাসীর মত তারা সফর থেকে বিদায় নিয়েছে।

আমাদের প্রতি আল্লাহর খাস রহমত এই যে, তিনি আমাদেরকে এই মাস পাওয়া পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। তিনি আমাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন। মৃত্যু আমাদেরকে অপহরণ করেনি, যেমন অন্যদেরকে করেছে। আমরা যদি আমাদের কোন আত্মীয়, প্রতিবেশী অথবা পরিচিত কাউকে নিয়ে একটু চিন্তা করে দেখি, যারা এখন মাটির নিচে সমাধিস্থ, যারা নিজেদের আমলের দায়ে দায়বদ্ধ, তাহলে বুঝতে পারি এই নেয়ামতের কদর কি?

কোথায় তারা, যারা গত বছর আমাদের সাথে সুস্থ-সবল থেকে রোযা রেখেছিল? এখন তারা অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পীড়ার খাটে বন্দী হয়ে পড়েছে।

রোযাদারের জন্য সুসংবাদ

আগমনের এক সপ্তাহ আগে ছাড়া আমরা রমযানকে স্মরণ রাখি না কেন? কেন সারা বছর ধরে রমযানের সাথে আমাদের হৃদয় বাঁধা থাকে না; যেমন সলফে সালেহীনদের থাকত?

যে প্রিয়তমের বিরহ সময় অতি লম্বা হয়, তার জন্য মুক্ত হৃদয়ে প্রতীক্ষা তত বেশী অসহনীয় হয়, তার জন্য প্রস্তুতিও হয় বড় যত্নের সাথে। পবিত্র মাস আসার আগে ঈমানী হৃদয় উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। মাসের শুভাগমনে ও তার কল্যাণে অন্তর পরিপ্লুত হয়। করুণাময়ের পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়ে আত্মা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করে থাকেন।

এই মাসের শুভাগমন ঘটলে মহানবী ﷺ নিজের সহচরবর্গকে সুসংবাদ দিতেন। সুতরাং ঈমানদার ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা এই রোযার মাসের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। যে মাস ইবাদত, আনুগত্য ও সংযমশীলতার মৌসম। যে মাস মঙ্গল ও বর্কতের ঋতু। যদিও এর সময়কাল বেশী লম্বা নয়, তবুও এতে নিহিত কর্মাবলী ও তার সওয়াব অনেক অনেক বেশী।

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি নেক আমল কবুল করে নেন। তিনি যে সকল ইবাদত, ওয়াজেব ও মুস্তাহাব কর্মাবলী বিধিবদ্ধ ও বান্দাকে করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন তা পালন করতে এবং যা তাঁর নিষিদ্ধ ও যা সন্দিগ্ধ তা হতে দূরে থাকতে

সাহায্য করেন। যাতে আপনারা খাঁটি ঈমানদার ও সত্য পরহেযগারে পরিণত হতে সক্ষম হন।

হে রোযাদার ভ্রাতৃবৃন্দ!

পৃথিবীর সর্বদেশে মুসলিমদের হৃদয় এই পবিত্র মাসের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় আজ আনন্দ ও সুখের উল্লাসে উল্লসিত। কারণ, তাঁরা জানেন যে, এ মাস তার সঙ্গে বয়ে আনছে পরম করুণাময়ের করুণা, তাঁর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি।

হে রোযাদার ভ্রাতৃবৃন্দ!

অভ্যাগত সম্মানীয় এই অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে তার যথার্থ আপ্যায়ন করুন। আল্লাহর নিকট সকল প্রকার পাপ থেকে তওবা করে তাঁরই দিকে ফিরে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানান। এই বর্কতময় মাসে ভালো কিছু করে আল্লাহকে দেখান। যেহেতু আল্লাহর নিকট রয়েছে অনেকানেক পুরস্কার। যে তা হতে বঞ্চিত হবে, সে অনেক কল্যাণ হতে বঞ্চিত রবে। সাধনার পর সাধনা করুন। এ মাসে ভালো কাজ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে আল্লাহর ওয়াস্তে নিয়তকে বিশুদ্ধ করুন। নচেৎ এমনও হতে পারে যে, আশা পূরণ হওয়ার আগে মৃত্যু এসে বাধ সাধবে। কিন্তু নিয়তই নিয়তকারীকে এমন এক মর্যাদায় উন্নীত করবে, যা তার আমল করতে পারত না।

রমযান একটি ট্রেনিং-কোর্স

সত্যপক্ষে রমযান পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্ম, সুচরিত্রতা, সংযমশীলতা ও সদাচরণের তরবিয়ত দিতে অতিরিক্ত যত্নপূর্ণ একটি ট্রেনিং-কোর্স। সুতরাং তাদেরকে এই মাসে নামাযে উদ্বুদ্ধ করুন, দান-খয়রাত করতে উৎসাহিত করুন, রোযা রাখতে তরবিয়ত দিন, অধিকাধিক যিক্র, কুরআন তেলাঅত ও অন্যান্য ইবাদত করতে অনুপ্রাণিত করুন। যদিও এ তরবিয়ত সব সময়ের জন্য ওয়াজেব, তবুও যেহেতু এ মাসে মুসলিমের হৃদয় অন্যান্য মাসের তুলনায় গ্রহণ করতে অধিক প্রস্তুত থাকে সেহেতু এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত। এ মাসেই মুসলিম তুলনামূলক অধিক ভালো কাজ করে থাকে, অধিক দুআ করে থাকে, অধিক নামায পড়ে থাকে এবং অধিক তওবা ও ইস্তিগফার করে থাকে।

রমযান হৃদয় পরিষ্কার করার ওয়ার্কশপ

রমযান হিংসা-বিদ্বেষ থেকে আমাদের হৃদয়কে পরিষ্কার ও বক্ষকে পরিচ্ছন্ন করে নেওয়ার একটি ওয়ার্কশপ। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মহান আল্লাহ অর্ধ শা’বানের রাত্রে (নেমে এসে) নিজ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে মুশরিক ও বিদ্বেষপোষণকারী ছাড়া তাদের

সকলকে ক্ষমা করে দেন।”[১] *(ত্বাব, ইহি, সিলসিলাহ সহীহাহ ১১৪৪নং)*

সুতরাং আর কতদিন আমরা একে অপর থেকে দূরে দূরে থাকব? আর কতদিন আমরা আপোসে মতবিরোধ করব? আর কতদিন আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করতে থাকব?

আসুন! এই পবিত্র মাসকে স্বাগত জানানোর সাথে সাথে আমরা আমাদের হৃদয়কে পরিষ্কার করে নিই। আমরা একে অন্যের জন্য নিজ নিজ হৃদয়কে উন্মুক্ত করি। আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হোক সম্প্রীতি ও ভালোবাসায়, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দে।

যে ব্যক্তি রমযানেও নিজ পিতামাতার অবাধ্য হয়ে থাকবে, আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে, ভাই-বন্ধু থেকে দূরে দূরে থাকবে, স্ত্রী-সন্তানের প্রতি দুর্ব্যবহারে মত্ত থাকবে, সে ব্যক্তি এ মাস দ্বারা আর কতটুক উপকৃত হবে? মহান আল্লাহ বলেন,

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)

অর্থাৎ, লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রসূলের। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। *(সূরা আনফাল ১ আয়াত)*

([১]) প্রকাশ থাকে যে, এ হাদীস শবেকদরের নামায-রোযা বা অনুষ্ঠান পালনের কোন দলীল নয়।

পরহেযগার হন

রোযাদার রোযা রেখে আল্লাহর ইবাদত করে। এ রোযার খবর তার ও তার প্রতিপালকের মাঝে গোপন থাকে। সে ঘরে থাকে, তার স্ত্রী থাকে তার পাশে, খাদ্য ও পানীয় থাকে তার হাতের কাছে, এমন জায়গায় যেখানে কেউ তাকে দেখে না, আল্লাহ ছাড়া কেউ তার খবর রাখে না। কিন্তু সে স্ত্রী-মিলন ও পানাহার ত্যাগ করে কেবল আল্লাহর ভয়ে ও তাঁর আনুগত্য করে। ইচ্ছা করলে সে গোপনে তা করতে পারে এবং মুসলিম সমাজকে ধোকা দিয়ে বলতে পারে, সে রোযাদার। কিন্তু সে সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী আল্লাহর কথা স্মরণ করে, সে বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তাকে সর্বাবস্থায় দেখছেন। ফলে তার মনে যথেষ্ট ভয় হয় এবং সে তাঁর অবাধ্য না হয়ে তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় সেই লোভনীয় ভোগ্য জিনিস ত্যাগ করে থাকে।

ভাই রোযাদার! আপনিও রোযা রাখার মত রোযা রাখুন। সম্ভবতঃ আপনিও মুত্তাকী, পরহেযগার ও সংযমশীলদের দলভুক্ত হবেন। আর যে মুত্তাকী হবে, আল্লাহ তার সাথী হবেন এবং আল্লাহ যার সাথী হবেন তার সাথে হবে এমন দল; যে কোনদিন পরাজিত হবে না, তার সাথী হবে অতন্দ্র প্রহরী, তার সাথী হবে এমন পথপ্রদর্শক যে কোনদিন পথভ্রষ্ট হবে না।

হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ যদি আপনার সাথের সাথী হন, তাহলে আর ভয় কিসের? পক্ষান্তরে আল্লাহ যদি আপনার বিপক্ষে হন, তাহলে কার কাছে আর কিসের আশা রাখেন?

সামাজিক বন্ধন-রজ্জু রমযান

সমাজের মানুষের অবস্থা যেমনই হোক, তাদের সকলেরই একই সময়ে পানাহার হতে বিরত থাকা এবং অন্য একই নির্দিষ্ট সময়ে পানাহার শুরু করা, নামাযীদের এক সাথে মসজিদে মিলিত হয়ে পরস্পরের মাঝে পরিচয়ের মাধ্যমে, অভাবী মানুষের অভাব দূর করার মাধ্যমে, ফিত্‌রার যাকাত তার হকদারদের মাঝে বিলি-বন্টনের মাধ্যমে, নানা ধরনের দান-খয়রাতের মাধ্যমে এবং এ বর্কতময় মাসে কৃত আরো অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে জামাআতী প্রতীক সৃষ্টি করার মাঝে এমন একটি অনুভূতি জাগরিত হয়, যা সমাজের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে এবং নানা কারণে সমাজের মানুষের মাঝে যে ভেদাভেদ ও অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে থাকে, তার ফলে তাও দূর হয়ে যায়।

প্রচার-মাধ্যমের সাথে বিরতিচুক্তি

প্রিয় ভাই! প্রিয় অভিভাবক! আপনার বাড়িতে যদি কোন প্রকার প্রচার-মাধ্যম (রেডিও, টিভি, ইন্টারনেট ইত্যাদি) থাকে, তাহলে এই পবিত্র মাসে তার ও আপনার পরিবারের মাঝে কোন বিরতিচুক্তি করার কথা ভেবে দেখবেন কি? যদিও আপনারা বৈধ কিছু দেখেন, তবুও এই যিক্‌র ও তেলাঅতের মাসে তার থেকে তফাতে থাকুন। আপনার ছেলে-মেয়েদেরকে সুন্দর কথার মাধ্যমে

উত্তম পদ্ধতিতে এ মাসের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়ে তা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করুন।

হ্যাঁ, কমসে কম এই মাসটা। হয়তো বা এটাই হবে সমাপ্তির শুরু - ইন শাআল্লাহ। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রমযান হল আত্মার তরবিয়তের মাস।

কিন্তু যদি কমসে কম এই পবিত্র মাসেও আপনি ও আপনার পরিবার ঐ প্রচার-মাধ্যম থেকে দূরে না থাকতে পারেন, তাহলে আর কখন পারবেন? এ মাসে তো মুসলিমের হৃদয়াত্মা ভালোর জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং শয়তানদলের পায়ে থাকে বেড়ি লাগানো।

সুতরাং ভাইজান! চেষ্টা করে দেখুন, এ কাজে আল্লাহর সাহায্য চান, হৃদয়-মনকে বিশুদ্ধ করুন। ইন শাআল্লাহ আল্লাহর কাছে সাহায্য পাবেন এবং আপনার পরিবারের নিকট থেকেও এ ব্যাপারে সাড়া পাবেন।

অনুরূপভাবে এই পবিত্র মাসে আমরা এও আশা করব যে, পত্র-পত্রিকা পড়াও বর্জন করুন; যদিও তা বৈধ।

সেইভাবে ইন্টারনেট খোলা হতেও দূরে থাকুন; যদিও তাতে আপনি বৈধ বা উপকারী কিছু দেখতে বা জানতে চান।

আমাদের সলফে সালেহীন এবং তাঁদের অনুগামীগণ এই মাসে হাদীস বর্ণনা ও ইলমের মজলিসও ত্যাগ করতেন এবং কেবল কুরআন তেলাঅত, রাতের নামায ও অন্যান্য ইবাদতে মনোযোগ দিতেন।

আপনি কি এক মাসের জন্যও বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যম (রেডিও, টিভি, ইন্টারনেট, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি) বর্জন করতে পারবেন না?

রমযান ও বদমেজাজি

সুচরিত্রবান মানুষ এমন একটি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, যার ফলে সে পরকালে মহানবী ﷺ-এর কাছাকাছি মর্যাদায় অবস্থান করতে পারবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কিছু মানুষ আছে যাদের চরিত্র ও ব্যবহার - বিশেষ করে - রমযানে ক্ষিদের জ্বালায় খারাপ হয়ে যায়। দেখবেন, এমন মানুষ রূঢ় ও কঠোর-চিত্ত হয়ে বসে। সে চায় না যে, কেউ তার সাথে কথা বলুক অথবা সে কারো সাথে কথা বলুক। ঘরে, কর্মস্থলে অথবা পথে-ঘাটে কারো কোন প্রকার ভুল আচরণ সে সহ্য করতে পারে না। অথচ এই শ্রেণীর ব্যবহার একজন রোযাদারকে যে সুচরিত্রের হওয়া উচিত তার পরিপন্থী। যে ব্যাপারে রসূল ﷺ রোযাদারকে উপদেশ দিয়ে বলেন, "রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের কারো রোযার দিন হলে সে যেন অশ্লীল না বকে ও ঝগড়া-হৈচৈ না করে; পরন্তু যদি তাকে কেউ গালাগালি করে অথবা তার সাথে লড়তে চায়, তবে সে যেন বলে, 'আমি রোযা রেখেছি, আমার রোযা আছে।" *(বুখারী ১৯০৪, মুসলিম ১১৫১ নং)*

অমূল্য সময়

তিনটি মূল্যবান এমন সময় আছে, যার ব্যাপারে অনেকেই অবহেলা প্রদর্শন করে থাকে; আর তা হল ঃ-

১। দিনের প্রথম ভাগ (ফজরের নামাযের পর)। যা সাধারণতঃ অনেকের ঘুমানো অবস্থায় নষ্ট হয়ে যায়।

২। দিনের শেষ ভাগ (আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত)। যা সাধারণতঃ ইফতারীর প্রস্তুতি নিতে নষ্ট হয়ে থাকে।

৩। সেহরীর সময়। যা কখনো কখনো লম্বা সময় ধরে নানা ধরনের সেহরী খেতে গিয়ে অথবা আগে-ভাগে সেহরী খেয়ে নিয়ে ঐ সময় ঘুমিয়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেন,

((فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى))

অর্থাৎ, সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর এবং রাত ও দিনের কতকাংশে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর; যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো। *(সূরা ত্বাহা ১৩০ আয়াত)*

সুতরাং আল্লাহর ওয়াস্তে উক্ত সময়গুলিকে গনীমত মনে করুন। নিজেকে অথবা অপরকে ঐ অমূল্য মুহূর্ত ও বর্কতময় সময়গুলি থেকে খবরদার বঞ্চিত করবেন না।

দুআ করুন দুআ

রোযাদার যখন অনুভব করবে যে, সে আল্লাহর নিকটবর্তী, তখন তার উচিত, বেশী বেশী দুআ করা। কবুলের প্রতি আশাবাদী ও আগ্রহী হয়ে তাঁর নিকট আকুল-মনে প্রার্থনা করা। অবশ্য সে যেন দুআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে। মহানবী ﷺ বলেন, “বান্দার দুআ কবুল হয়েই থাকে যতক্ষণ সে কোন পাপের অথবা জ্ঞাতিবন্ধন টুটার জন্য দুআ না করে এবং (দুআর ফল লাভে) শীঘ্রতা না করে।” জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রসূল! শীঘ্রতা কেমন? বললেন, “এই বলা যে, ‘দুআ করলাম, আরো দুআ করলাম। অথচ কবুল হতে দেখলাম না।’ ফলে সে তখন আক্ষেপ করে এবং দুআ করাই ত্যাগ করে বসে।” *(মুসলিম ৪/২০৯৬)*

বলা বাহুল্য, দুআর ফললাভে শীঘ্রতা দুআর কল্যাণ থেকে বান্দাকে বঞ্চিত করে; যখন তার হৃদয়-মনে নৈরাশ্য বাসা বাঁধে এবং সে দুআ ছেড়ে বসে। আর নিঃসন্দেহে এ হল শয়তানের চক্রান্ত।

সুতরাং মুমিন কোনদিন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। বরং তার হৃদয় এই প্রত্যয়ে পরিপূর্ণ থাকে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে মঙ্গল দিয়ে সম্মানিত করবেন। কিন্তু সেই মঙ্গলের সময় ও স্থান একক আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এবং নির্ধারণও করে না। তাই আমাদের উচিত, কেবল আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে যাওয়া, আল্লাহর প্রতি অভিমুখী হয়ে বিনয়ী ও উপস্থিত হৃদয়ে প্রার্থনা করে

যাওয়া, দুআর সাথে সাথে নেক আমল করা, পাপাচরণ থেকে দূরে থাকা এবং দুআ কবুল হওয়ার বিদিত সময় ও স্থান সন্ধান করে দুআ করে যাওয়া।

রোযাদারের দুআ কবুল হওয়ার বেশী উপযোগী। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "তিনটি দুআ কবুল হয়ে থাকে; রোযাদারের দুআ, অত্যাচারিতের দুআ এবং মুসাফিরের দুআ।" *(বাঃ, সঃজাঃ ৩০৩০নং)*

দান-খয়রাতের মাস রমযান

দান-খয়রাত সাধারণভাবে আল্লাহর নৈকট্যদানকারী এবং জান্নাতে প্রবেশাধিকার দানকারী একটি ইবাদত। এতে মাল-ধন কমে যায় না; বরং বৃদ্ধিই পেতে থাকে। যেমন মহাদাতা ও দানশীল আল্লাহ দানশীল বান্দাকে ওয়াদা দিয়েছেন এবং যিনি তাঁর ওয়াদা খিলাফ করবেন না। তিনি বলেছেন,

(وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ)

অর্থাৎ, তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার বিনিময় দেবেন। *(সূরা সাবা ৩৯ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "সদকা মাল কমিয়ে দেয় না।" *(আঃ, মুঃ, সজাঃ ৫৮০৯নং)*

এটি একটি বড় মূল্যবান সুযোগ যে, বান্দা কিছু মাল সদকা করে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে, অথচ তার মাল কমেও যাবে না; বরং বৃদ্ধি পাবে।

আল্লাহর পথে ব্যয় করার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে বহু সংখ্যক আয়াত রয়েছে। দান-খয়রাত হল কল্যাণের বড় বড় দরজাসমূহের অন্যতম। ইসলামে ধন-ব্যয় এক প্রকার আল্লাহর পথে জিহাদ। বরং কুরআন মাজীদের একটি আয়াত ছাড়া বাকী অন্যান্য সকল আয়াতেই মাল দ্বারা জিহাদকে জান দ্বারা জিহাদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং মাল দ্বারা জিহাদের কথা জান দ্বারা জিহাদের আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, এই মাসে আমাদের উচিত দানবীর নবী ﷺ-এর অনুকরণ করা। তিনি ছিলেন সবার চাইতে বেশী দানশীল। আর রমযানে যখন জিবরীল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি অধিক দানশীল হতেন। *(বুখারী ৬, মুসলিম ২৩০৭নং)*

তাঁর দানশীলতা কেবল ধন দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং ইল্ম, মাল, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য জান, মানুষকে হেদায়াত, সর্বতোভাবে মানুষের কল্যাণসাধন; ক্ষুধার্তকে অন্নদান, অজ্ঞকে জ্ঞানদান, অভাবীর অভাব মোচন, প্রয়োজন পূরণ, বোঝা বহন ইত্যাদি সকল প্রকার দানশীলতা তাঁর অনুপম চরিত্র ছিল।

সুতরাং হে ভাই রোযাদার! দান যত সামান্যই হোক না কেন, তা দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা দোযখ থেকে বাঁচো; যদিও এক টুকরা খেজুর দান করে হোক।" *(বুখারী)*

জেনে রাখুন যে, আপনি এ দানশীলতা ও দান-খয়রাতের মাসে কালাতিপাত করছেন। আর রমযানের সদকা হল সবার চেয়ে উত্তম সদকা। অতএব যথাসাধ্য দান করতে চেষ্টা করুন। কল্যাণের বিভিন্ন

পথে কোন না কোনভাবে অংশগ্রহণ করুন। আপনার মাল আজ আপনার হাতে আছে, আপনি জানেন না যে, রাতের অন্ধকার নেমে এলে সে মাল আপনার থাকবে, নাকি আপনার ওয়ারেসদের হাতে চলে যাবে। অতএব জীবনের বাতি নিভে যাবার আগে দান করে যান আল্লাহর পথে।

রমযান বীরত্ব ও বিজয়ের মাস

বর্কতময় এই রমযান মাস মুসলিম উম্মাহর উজ্জ্বল ইতিহাসের পাতায় বছরের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ মাস। এ মাস বিজয় ও সফল জিহাদের মাস। এই মাসে একাধিক ইসলামী জিহাদ সংঘটিত হয়। যেমন বদর যুদ্ধ, মক্কা-বিজয় যুদ্ধ, আন্দালুস (স্পেন) বিজয় যুদ্ধ, আইনে জালূত যুদ্ধ প্রভৃতি।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই এই মাসে সলফে সালেহীনদের বিপরীতগামী পথ অবলম্বন করে থাকে। তাদের অবস্থা এমন হয় যে, তা দেখে কান্না আসে। যেহেতু তাদের অনেকেই এ মাসকে শৈথিল্য, আলস্য এবং কর্ম-বিরতির মাস হিসাবে গণ্য করে থাকে। তাদের ব্যবহার নোংরা হয়ে যায়। নিজেদের দায়িত্ব পালনে জড়তা প্রদর্শন করে। নিজেদের কাজে-কর্মে বিরক্তি ও ক্লান্তি প্রদর্শন করে। ফাল্লাহুল মুস্তাআন।
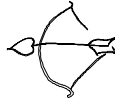
তওবার মাস রমযান

মানুষ যতদিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকে, ততদিন তার সাধ ও কামনা অপূরণ থাকে। পাপ পথে হলেও মন চায় না বাসনা চরিতার্থ ও তৃপ্তি গ্রহণ করা থেকে বিরত হতে। এ দিকে শয়তান অন্তরে গয়ংগচ্ছ ভাব সৃষ্টি করে শেষ বয়সে তওবাকে পিছিয়ে দেয়। মানুষের যত বয়স বাড়ে, তত তার সাধও বেড়ে চলে। আয়ু যত বৃদ্ধি পায়, মাল-ধন ও দীর্ঘায়ু লাভের লোভ তত বর্ধমান হয়। আসলে মানুষের কামনা-বাসনার কোন সীমা নেই। মহানবী ﷺ বলেন, “আদম সন্তান বড় হয়, বড় হয় তার সাথে দুটি জিনিস; ধনলোভ ও দীর্ঘায়ু কামনা।” *(বুখারী)*

মহান আল্লাহ সৃষ্টির সেরা মানুষ মুমিনদেরকে সম্বোধন করে তাদের ঈমান আনয়ন, ধৈর্যধারণ, হিজরত ও জিহাদের পর তওবা করার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

((وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ))

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(সূরা নূর ৩১)*

তিনি আরো বলেছেন,

((وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ))

অর্থাৎ, যারা তওবা করে না, তারাই সীমালংঘনকারী। *(সূরা হুজুরাত ১১ আয়াত)*

সুতরাং মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত; তওবাকারী ও সীমালংঘনকারী। এই দুই শ্রেণীর মানুষ ছাড়া তৃতীয় কোন শ্রেণী মোটেই নেই।

ভাইজান! তওবা কিন্তু কেবল মন্দ কর্ম ও পাপাচরণ বর্জন করারই নাম নয়। বরং নফল ইবাদত ত্যাগ করা এবং ভালো কাজ অবিরত না করা হতেও তওবা করতে হয়। সুতরাং আপনি সুন্নাতে মুআক্কাদাহর ব্যাপারে অবহেলা এবং তারাবীহ ও শবেকদরের নামায নষ্ট করা হতে তওবা করুন। তওবা করুন কৃপণ ও ব্যয়কুণ্ঠ হওয়া থেকে। আল্লাহর কাছে তওবা করুন দ্বীনী বিষয়ে আপনার ঔদাস্য থেকে এবং মূল্যবান সময় নষ্ট করা থেকে।

প্রিয় ভাইজান! মানুষের সারা জীবনটাই তওবার সময়। কিন্তু রমযানে তওবা করতে বিশেষ অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। কারণ এ মাসে আল্লাহর আনুগত্যের যে সুযোগ লাভ হয়, তা অন্য মাসে হয় না। এ মাসে বেহেশ্তের দরজাসমূহ উন্মুক্ত থাকে, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ থাকে এবং শয়তানদল থাকে শৃঙ্খলিত।

প্রিয় ভাইজান! যদি আপনি কোন পাপাচরণে লিপ্ত হয়ে থাকেন, তাহলে এ মাসে তওবার সাথে তা বর্জন করুন। ধর্মভীরুতা, সৎশীলতা ও সফলতার জন্য এই মাসের বর্কতময় দিনগুলিকে আপনি আপনার নতুন জন্মদিন মনে করুন।

পক্ষান্তরে যে মুসলিম তার জীবনের কোন ক্ষেত্রে গোনাহ করেই ফেলেছে, তওবা কবুল হবে না মনে করে তার নিরাশ হওয়া উচিত নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বড় মহানুভব। তিনি কোন প্রার্থনাকারীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। তাঁর রহমত সর্বত্রে

ছড়িয়ে আছে। সেই প্রতিপালক সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা হতে পারে, যিনি এমন এক ব্যক্তিকেও জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন, যে তাঁর জন্য একটি সিজদাও করেনি! সেই প্রতিপালক সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা হতে পারে, যিনি এমন এক ব্যক্তিকেও জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন, যে একশ'টি খুন করেছিল! সেই প্রতিপালক সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা হতে পারে, যিনি একটি কুকুরকে পানি পান করানোর ফলে এক বেশ্যাকে জান্নাতে স্থান দিয়েছেন! তাদের হৃদয়ের সততা, তাদের মনের অনুতাপ ও আক্ষেপ, তাদের ভগ্নাবস্থা, ভয় ও লাঞ্ছনার কথা জেনে পরম করুণাময় তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

সুতরাং আমাদের উচিত, বিশুদ্ধ তওবা করার মাধ্যমে এই মাসকে বরণ করা, তাহলেই আমরা লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত হতে রক্ষা পাব।

যে রমযানে তওবা না করে, সে আর কখন তওবা করবে? যে এ মাসে আত্মসমালোচনা না করে, সে আর কখন তা করবে? যে এ মাসে রঙ-তামাশা ও ঔদাস্যের আড্ডা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারল না, যে এ পবিত্র মাসে নোংরামি ও অশ্লীলতার যন্ত্রাদিকে তালাক দিতে পারল না, সে আর কোন্ মাসে তা পারবে?

এ মাসে বেহেশ্তের সকল দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে; তার একটি দরজাও বন্ধ নেই। দোযখের সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে; তার একটি দরজাও খোলা নেই। সকল শয়তান ও দুর্দম জিনকে বন্দী করে রাখা হয়েছে; যাদের একটিও ছাড়া নেই। আহবানকারী

আহবান করে বলছেন, 'ওহে কল্যাণকামী! তুমি অগ্রসর হও। আর ওহে মন্দকামী! তুমি ক্ষান্ত হও।' এই পরিবেশে মানুষকে সৎকাজে উৎসাহিত দেখে, রোযা, নামায ও অন্যান্য ইবাদতে তাদেরকে প্রতিযোগিতা করতে দেখে; এই ঈমানী পরিবেশে যদি আপনি তওবা না করতে পারেন, তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, আবার কোন্ পরিবেশে আপনি তা করতে পারবেন?

মহানবী ﷺ বলেন, "সেই ব্যক্তির নাক ধূলাধূসরিত হোক, যে রমযান পেল অথচ সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হল না।" *(তিরমিযী)*

এটি এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ, যা হয়তো দ্বিতীয়বার হাতে আসবে না। এমন সুযোগ ফিরে পাওয়া বিরল ব্যাপার। সুতরাং আছে কি কোন সচেষ্ট আগ্রহী? এ দিনগুলি আমাদের জন্য গনীমত স্বরূপ। আমরা কি তা লাভের চেষ্টা করব?

আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধ তওবা করুন। সম্ভবতঃ তিনি পাপরাশি মাফ করে দেবেন এবং অল্প সওয়াবকে অধিকে পরিণত করবেন।

রমযানী উদ্যোগ

পবিত্র এই রমযান মাসে নিম্নোক্ত কর্মাবলীর উদ্যোগ নিন ঃ-

১। রোযা ইফতারী করানোতে অংশগ্রহণ করুন। এতে ডবল রোযা রাখার সওয়াব পাবেন।

২। নামাযের জন্য সকাল সকাল মসজিদে উপস্থিত হন, প্রথম কাতারে স্থান অধিকার করুন। চেষ্টা করুন, যাতে ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমা ছুটে না যায়।

৩। প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্য ওঠা পর্যন্ত মসজিদে বসে যিক্‌র ও তেলাঅত করার পর ২ রাকআত নামায পড়তে অভ্যাসী হন।

৪। দুআ কবুল হওয়ার সময়গুলিকে গনীমত মনে করুন।

৫। পারলে উমরা করুন। কারণ এ মাসের উমরা মহানবী ﷺ-এর সাথে হজ্জ করার সমান।

৬। প্রত্যহ ৩ পারা, না পারলে কমসে কম ১ পারা কুরআন তেলাঅত করুন।

৭। কমসে কম এক রাতের জন্য ই'তিকাফ করুন। মহল্লার মসজিদে এই সুন্নতকে জীবিত করুন।

৮। সকাল-সন্ধ্যার যিক্‌র-আযকার নিয়মিত পাঠ করুন এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণে রাখুন।

৯। পিতামাতা থেকে পৃথক থাকলে ইফতারীর সময় একত্রে একই দস্তরখানে ইফতার করুন।

১০। নিয়মিত প্রত্যেকদিন বিতর সহ তারাবীহর নামায পড়ুন।

১১। প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু দান করার চেষ্টা করুন।

১২। রোযা অবস্থাতেও দাঁতন করতে ভুলবেন না; কারণ তাতে রয়েছে প্রচুর সওয়াব।

১৩। জুমআর দিন সকাল সকাল গোসল সেরে, আতর লাগিয়ে মসজিদে হাযির হন। এই দিনের শেষ সময়কে দুআ ও ইস্তিগফারের মাঝে অতিবাহিত করুন।

১৪। প্রত্যেক ওযুর পর ২ রাকআত নামায পড়ুন।

১৫। শবেকদরের রাত্রি জেগে ইবাদত করার পরিপূর্ণ চেষ্টা করুন। কারণ তাতে আছে ৮৩ বছর অপেক্ষা বেশী সময় ধরে ইবাদত করার সওয়াব।

রমযান ও মহিলা

রমযান এলে পুরুষরা যে ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে থাকে তার থেকে পৃথক ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে থাকে মা-বোনেরা। তাই তাদের কথাই এবার বলব।

রমযান আসার সময় কাছাকাছি হলে মহিলারা নিম্নলিখিতরূপে প্রস্তুতি নিলে রোযা অবস্থায় অধিকাধিক উপকৃত হতে পারবে।

১। বর্কতময় এই মাসকে বরণ করার পূর্বে মানসিকভাবে পূর্ণ প্রস্তুতি নিন। মহান আল্লাহ রোযাদারদের জন্য যে সকল প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন তা আপনার মনে স্মরণ করুন। আপনি গৃহিণী; অতএব আপনার বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য উদ্বুদ্ধকারী এমন কার্যক্রম তৈরী করুন; যার ফলে তারা রোযা রাখতে উদ্বুদ্ধ হয়। যেমন রমযান উপলক্ষ্যে মুবারকবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে কোন কোন আত্মীয়র বাড়ি বেড়াতে যান। রমযানে কুরআন কারীম হিফযের উপর প্রতিযোগিতা রাখুন। তেলাঅতের উপর পুরস্কার ঘোষণা করুন।

এইভাবে পরিবারের সকলের মনে মানসিক প্রস্তুতি সৃষ্টি হলে রমযান মাস থেকে আমরা যথেষ্টভাবে উপকৃত হতে পারব।

২। সংসারের যে কাজ বর্তমানে না করলেও চলে, অথবা যা করা

জরুরী নয়; যেমন বাড়ির ভিতরে স্টোর রুম, ঝাড়বাতি, বাগান ইত্যাদি পরিষ্কার করার কাজ রমযান আসার পূর্বেই সেরে ফেলুন; যাতে বর্কতময় দিনগুলিতে আপনার সময়ের অপচয় না ঘটে।

৩। ইফতারীর জন্য রমযানের আগেই এমন নাশ্তা তৈরী করে নিন যা ফ্রিজে রেখে নিয়ে সারা মাস খাওয়া যায়। এর ফলেও আপনার অনেক সময় বেঁচে যাবে।

৪। নিয়মিত হাসপাতাল বা অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডেট বা এপোয়েন্টমেন্ট পরিবর্তন করে রমযানের আগে অথবা পরে করে নিন। কারণ এতে প্রচুর সময় নষ্ট হয়।

৫। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীকে প্রদেয় রমযানী উপহার আগে থেকেই প্রস্তুত রাখুন। যেমন খামের মধ্যে মুবারকবাদের চিঠি, ইসলামী ক্যাসেট ও পুস্তিকা ইত্যাদি।

৬। ঈদের পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস রমযানের আগে অথবা তার শুরুতেই কিনে ফেলুন। নচেৎ শেষ দশকে আপনার ও আপনার অভিভাবকের অতি মূল্যবান অনেক সময় মার্কেটেই নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া বাজার দরও সে সময় অনেক বেশী হবে, মনমত পছন্দের জিনিস পাওয়াও দুষ্কর হবে এবং বাজারও হবে ভিড়ে ভর্তি।

মহিলার ইবাদত

রোযাদার মা-বোনেরা! এই রোযার মাসে বেশী বেশী সওয়াব কিভাবে কামাবেন?

এ মাসে বেশী বেশী সওয়াব কামাবার একাধিক উপায় আছে; সে উপায় অবলম্বন করুন, পরিবারের সকলকে শিক্ষা দিন। উপায়গুলি নিম্নরূপ ঃ-

১। ফরয নামায প্রত্যেক মাসেই পড়েন। কিন্তু রমযান মাসে তার গুরুত্ব বেশী হওয়া চাই। আর তার জন্য নিম্নের নির্দেশাবলীর অনুসরণ করুন ঃ-

(ক) নামাযের সময় হলে পবিত্রতার সাথে তার জন্য প্রস্তুতি নিন।

(খ) সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আদায় করুন, যার দরুন বেহেশ্তে বড় বড় মহল লাভ করতে পারবেন।

(গ) ওযু অথবা নামাযের পূর্বে দাঁতন করুন।

(ঘ) 'নামায পড়ুন' নয়; বরং 'নামায কায়েম' করুন। অর্থাৎ নামাযে তার যাবতীয় আরকান, ওয়াজেব ও মুস্তাহাব ইখলাসের সাথে মহানবী ﷺ-এর তরীকা অনুযায়ী আদায় করুন।

(ঙ) নামাযের পর নির্দিষ্ট যিক্র পাঠ করুন।

(চ) মুসাল্লায় বসে তসবীহ অথবা কুরআন তেলাঅত করুন।

(ছ) মুসাল্লায় বসে অন্য নামাযের অপেক্ষা করুন। এতে পাবেন প্রতিরক্ষা বাহিনী সেনার মত সওয়াব।

(জ) মুসাল্লায় বসে থাকার সওয়াব স্মরণে রাখুন; আল্লাহর রসূল

ﷺ বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নামাযেই থাকে যতক্ষণ নামায তাকে আটকে রাখে। (আগামী নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করে মুসাল্লায় বসে থাকে।) আর সেই সময় ফিরিশ্তাবর্গ বলতে থাকেন, ‘হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! ওর প্রতি সদয় হও।’ (এই দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে) যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নামাযের স্থান ত্যাগ করেছে অথবা তার ওযু নষ্ট হয়েছে।” *(বুখারী, মুসলিম প্রমুখ)*

(ঝ) নামায পড়ার সময় মনে করুন, যেন এটাই জীবনের শেষ নামায।

২। সংসারের কোন কাজকে ভারি মনে না করে তাতে সওয়াবের আশা রাখুন। বিশেষ করে ইফতারীর নাশ্তা প্রস্তুত করার সময় নিয়ত ঠিক রাখলে আপনার তৈরীকৃত নাশ্তায় যতজন ইফতার করবে ততটি রোযার সওয়াব আপনি একাই পেতে পারবেন।

৩। সংসারের কাজ করতে করতেই আল্লাহর যিক্র করতে থাকুন। আপনার জিহবাকে আল্লাহর যিক্র দ্বারা আর্দ্র রাখুন। গীবত ও পরের সমালোচনা থেকে শতক্রোশ দূরে থাকুন।

৪। নিফাস বা মাসিক শুরু হলে মহিলার নামায-রোযা বন্ধ হয়ে যায়। তা বলে এ সময় নিজেকে একেবারে ইবাদতের বাইরে মনে করা ঠিক নয়। এ সময় তার জন্য যা করা বৈধ তা করতে উদাসীন হওয়া উচিত নয়। যেমন এ সময় সে কুরআন তেলাঅত করে সওয়াবের অধিকারী হতে পারে। অবশ্য এই অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করবে না। তবে প্রয়োজনে কোন কভার দ্বারা তা স্পর্শ করতে

পারবে। *(ফাইঃ ২/১৪৫)*

অনুরূপভাবে ইল্‌ম অনুসন্ধান করা এক প্রকার ইবাদত। আর তা করতে নানা ইসলামী বই বা পত্র-পত্রিকা পড়তে পারে। বসে কুরআন বা ইসলামী বক্তৃতার ক্যাসেট শুনতে পারে। এ ছাড়া দুআ-দরূদ, ইস্তিগফার, তাসবীহ-তাহলীল, দান-খয়রাত, ইফতারীর নাশ্তা প্রভৃতি প্রস্তুত করার মাধ্যমে ঐ মহিলা অঢেল সওয়াব; বরং অনেক ক্ষেত্রে রোযাদার অপেক্ষা বেশী সওয়াবের অধিকারিণী হতে পারে।

যেমন সফরে কখনো রোযা না রাখাটা উত্তম ও অধিক সওয়াব লাভের কারণ হতে পারে; যদি মুসাফির কোন কর্ম-দায়িত্ব পালন করে তাহলে। আনাস ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ (সাহাবা সহ) এক সফরে ছিলেন। তাঁদের কিছু লোক রোযা রাখল এবং কিছু রাখল না। যারা রোযা রাখেনি তারা বুদ্ধি করে রোযা ভাঙ্গল এবং কাজ করল। আর যারা রোযা রেখেছিল তারা কিছু কাজ করতে দুর্বল হয়ে পড়ল। তা দেখে তিনি বললেন, “আজ যারা রোযা রাখেনি তারাই সওয়াব কামিয়ে নিল।” *(বুঃ ২৮৯০, মুঃ ১১১৯নং, আর হাদীসের শব্দাবলী তাঁরই, নাঃ)*

এখানে একটি অভিমত পেশ করা বা সেই অনুযায়ী আমল করা দূষণীয় নয়। সংসারে একাধিক মহিলা থাকলে কাজ ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে যে মহিলার নামায-রোযা নেই, সেই রান্না-বাড়ার দায়িত্ব নিতে পারে এবং অন্যান্যরা নামায ইত্যাদির ইবাদতে মশগুল থাকতে পারে।

আপনার ওযর থাকার ফলে নামায-রোযা না থাকলেও আপনি সেই সওয়াবেরই অধিকারিণী হবেন, যে সওয়াব সুস্থ অবস্থায় পেতেন। অতএব এ কথা মনে রেখে আপনি সুসংবাদ নিন।

৫। কুরআন তেলাঅতের সময় তার অর্থ বুঝার চেষ্টা করুন। মাসে যাঁরা ২/৩ বার কুরআন খতম করেন, তাঁরা যদি অন্ততঃপক্ষে ১ বার তফসীর সহ বুঝে পড়েন, তাহলে কতই না উত্তম হয়।

মহিলা ও রান্নাশাল

দৈনন্দিন জীবনে অধিকাংশ মহিলাকে রান্নাশালে প্রবেশ করতেই হয়। তাই বিশেষ করে রমযানে নিম্নের নির্দেশাবলী পালনীয় ঃ-

(ক) আপনার ছেলেমেয়ে ছোট বড় সবাইকে এ কথা বুঝান যে, রমযানের লক্ষ্য নানা রকম পানাহার করা এবং তার জন্য দৈনিক ১০/২০ রকমের খাবার প্রস্তুত করা নয়। বরং উত্তম হল, দুই অথবা তিন রকমের খাবার যথেষ্ট মনে করা।

অতঃপর যে খাবার তৈরী করবেন তার ব্যাপারে তাদের মতামত গ্রহণ করুন। সপ্তাহান্তে পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখুন। এতে আপনার খাবার প্রস্তুতের কাজ সহজ হবে। আপনি আগে থেকেই জানতে পারবেন আপনাকে কি করতে হবে। এ ছাড়া ছেলেমেয়েদেরও নিয়ম-শৃঙ্খলাবোধের প্রশিক্ষণও হবে। এর ফলে আপনি নিষিদ্ধ অপব্যয় ও অপচয় থেকেও বাঁচতে পারবেন। সংসারে খরচ কম হবে এবং খাবারের ধরন পাল্টে সারা মাসে নতুন ধরনের খাবারও

খেতে পারবে সকলেই।

(খ) আপনার কিচেনের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একটি টেপরেকোর্ডার রেখে নিন। এর মাধ্যমে রান্না কাজের সাথে সাথে শুরুতে রমযান সম্পর্কীয় ক্যাসেট শুনুন। অতঃপর অন্যান্য ইসলামী প্রোগ্রামের ক্যাসেট শুনতে থাকুন। অবশ্য গজল ইত্যাদি শোনা হতে দূরে থাকুন। কারণ তা বৈধ হলেও রমযানের দিনগুলি তার উপযুক্ত সময় নয়।

(গ) খাবার প্রস্তুত করার সময় আল্লাহর যিক্র করতে থাকুন।

(ঘ) সময় বাঁচানোর জন্য রান্নাকাজে আধুনিক ইলেক্ট্রিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করুন; যেমন মসলা না বেঁটে মেশিনে পিসুন, আটা হাতে না ঘুলে মেশিনে ঘুলুন ইত্যাদি।

(ঙ) এমন খাদ্য বা পানীয় প্রস্তুত করা থেকে দূরে থাকুন, যার জন্য লম্বা সময় ব্যয় হয়। অবশ্য সেই ধরনের কোন খাবার রেডিমেড কিনে খেতে পারেন। এতে পয়সা খরচ হলেও, পয়সা চাইতে আপনার রমযানের সময়ের দাম অনেক বেশী।

(চ) পবিত্র এই মাসে পার্টি বা অনুষ্ঠান করা হতে দূরে থাকুন। কারণ তাতে খাবার ও সময় দুয়েরই অপচয় হয়।

আপনি যদি দাসী রেখে সংসার বা রান্নার কাজ নিয়ে থাকেন, তাহলে তাকেও তার সাধ্যের বাইরে কোন কাজের ভার দিবেন না। কারণ সেও আপনার মত সওয়াব পেতে কামনা করে। পানভোজনে ধোওয়া-পরিষ্কার করার কাজটাই সবচেয়ে কঠিন। অতএব সে কষ্ট থেকে বাঁচতে এবং সময় বাঁচাতে কিছু পয়সা খরচ করে প্লাস্টিকের

(ওয়ান-টাইম) পাত্র ও দস্তরখান ব্যবহার করুন। এতে দাসীর কাজও হাল্কা হয়ে যাবে।

দাসীর ইবাদতের জন্য উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আপনারও কর্তব্য। এ মাসের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা জানতে তাকেও ইসলামী বই পড়তে এবং ক্যাসেট শুনতে সুযোগ দিন। সে মুসলিম না হলেও তার মনে ইসলামের প্রতি ভক্তি জাগবে এবং একটি মানুষকে ইসলামের আলো দেখানোর জন্য বিরাট সওয়াবের অধিকারিণী হবেন আপনি।

মহিলা ও দান-খয়রাত

প্রকৃত রোযাদার মহিলা সে, যে অহংকার, গর্ব ও স্বার্থপরতা থেকে নিজেকে পবিত্রা করতে পারে। যে মহিলা শুধু নিজের আরাম-আয়েশের কথা ভাবে না; বরং সে মুসলিম উম্মাহর সমস্যা নিয়ে নানা ভাবনা ভাবে। অপরের কষ্টে সে কষ্ট পায়, পরের দুঃখে ব্যথা অনুভব করে হৃদয়ে। দুর্বল, দুঃস্থ ও নিঃস্ব মুসলিমদের প্রয়োজন ও অভাবের কথা তার মনে সহানুভূতি সৃষ্টি করে। ফলে তাদের সেই প্রয়োজন ও অভাব পূরণের প্রচেষ্টায় উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। কষ্ট-পীড়িত মানুষের কষ্টের ভার হাল্কা করার জন্য অস্থির হয়ে উপায় অনুসন্ধান করে। অতঃপর যখন সে তার পরিকল্পনায় সফলতা লাভ করে, তখন তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তার বিবেক ও হৃদয় স্বস্তি লাভ করে।

দানশীলতার ব্যাপারে আপনার পথিকৃৎ হলেন মা আয়েশা (রাঃ)। তিনি একদিন এক লক্ষ দিরহাম দান করলেন। তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। ইফতারীর সময় হলে তাঁর দাসী তাঁকে বলল, 'আপনি যদি আজকের ইফতারী করার মত কিছু রেখে নিতেন!' এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'যদি স্মরণ করিয়ে দিতে, তাহলে রাখতাম!'

সুবহানাল্লাহ! আজীব দানশীলতা। দান করতে গিয়ে নিজের ভোগ্য অংশের কথাও ভুলে গেছেন।

আপনিও কিভাবে দানশীলাদের দলভুক্ত হতে পারেন, তারই কতিপয় উপায় আপনাকে বলব ঃ-

১। নিসাব পরিমাণ (সাড়ে ৭ ভরি) হলে স্বর্ণের যাকাত আদায় করুন এবং বর্কতময় দিনগুলিতে তা হকদারদের মাঝে বিতরণ করুন। যেহেতু এ দিনগুলিতে সওয়াব বহুগুণ বেশী হয়ে থাকে।

২। গরীব-মিসকীনদের জন্য অতিরিক্ত নাশ্তা তৈরি করে তাদেরকে ইফতার করান। প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দিয়ে ইফতারী করান। এতে রয়েছে ডবল রোযা রাখার সওয়াব এবং প্রতিবেশী ও আত্মীয়র প্রতি সদ্ব্যবহার।

৩। সামর্থ্য থাকলে একটি গরীব পরিবারের জন্য সারা মাসের পানাহারের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

৪। যথাসম্ভব প্রতিদিন কিছু না কিছু সদকা করার অভ্যাস বানিয়ে নিন; কোনদিন টাকা-পয়সা, কোনদিন, খাদ্য, কোনদিন পোশাক, কোনদিন ফলমূল, কোনদিন ক্ষেতের ফসল ইত্যাদি। আর চেষ্টা করুন, যাতে আপনার এ দান গোপনে হয়।

রমযান ও আমাদের শিশু-কিশোর

এ পবিত্র মাসে শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়াও সওয়াবের একটি উপায়। সম্ভবতঃ এই মাসই তাদের জন্য কল্যাণের পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রমাণিত হবে। রমযানের এই বর্কতময় মাদ্রাসায় পাশ করে পিতামাতার বাধ্য ও অনুগত সন্তান হিসাবে পরিচিত হবে। তৈরি হবে সেই সন্তানরূপে, যার উপকারিতা পিতামাতা মরণের পরেও উপভোগ করবে তার দুআর মাধ্যমে।

সুতরাং পিতামাতার তরফ থেকে তারা এ মাসে অধিক যত্ন ও আগ্রহ পাওয়ার যোগ্য। যাতে এই ঈমানী সৌরভময় পরিবেশে তাদের কচিকাঁচা মন ও মগজে সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রতার বীজ রোপণ করা অতি সহজ হয় এবং কুঅভ্যাস ও অসচ্চরিত্রতার আগাছা সমূলে বিনাশ করা সম্ভব হয়।

উক্ত লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য আমরা নিম্নের নির্দেশাবলীর অনুসরণ করতে পারি ঃ-

১। রমযান আসার পূর্বে শিশু-কিশোরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলুন; আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে রমযানের প্রতি অধিক আগ্রহী করে তুলুন। কি করলে কি সওয়াব হয় -এর উল্লেখ শুনলে তাদের মনে ঈমানী উৎসাহ বদ্ধমূল হবে এবং ইন শাআল্লাহ তারা ঈমানদার আদর্শ মানুষরূপে বড় হয়ে উঠবে।

২। তাদেরকে রোযা রাখতে অভ্যাসী করে তুলুন। আর এ কাজে

সহযোগিতা নিতে নিম্নের নির্দেশাবলী গ্রহণ করুন ঃ-

(ক) শিশুর মনে এ কথা বদ্ধমূল করুন যে, রোযা আমাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের জন্য ফরয। যা আমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপরও ফরয ছিল। রোযা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। আর এ ফরয পালনের জন্য পূর্ব থেকে তাকে ট্রেনিং নিতে হবে।

(খ) শিশুকে বুঝান, সে বড় হয়েছে বা বড় হতে চলেছে। অতএব তাকেও বড়দের মত রোযা রাখতে হবে।

(গ) প্রথম দিন রোযা রাখতে শুরু করলে, বাড়ির সকলে এক সঙ্গে তাকে নিয়ে সেহরী খান এবং পুরো দিন তাকে উৎসাহ দিতে থাকেন, যাতে রোযা ভেঙ্গে না ফেলে।

(ঘ) ক্ষুধা অথবা পিপাসার কথা প্রকাশ করলে তাকে এমন কিছু (খেলনা ইত্যাদি) দিয়ে ব্যস্ত করুন, যাতে ইফতারী পর্যন্ত পানাহারের কথা ভুলে থাকে।

(ঙ) রোযা পূর্ণ করলে পরিবারের সকলে তাকে ধন্যবাদ জানান, সকলের সামনে তার জন্য দুআ ও প্রশংসা করুন এবং বিনিময়ে একটি কিছু উপহার দিন।

(চ) রোযা না রাখতে চাইলে অথবা ভেঙ্গে ফেললে তাকে মারবেন না এবং গালাগালি করে অপমান করবেন না।

(ছ) তার সমবয়সী বা সহপাঠী যারা রোযা রাখে তাদের কথা প্রশংসার সাথে উল্লেখ করুন; যাতে সেও তাদের অনুকরণ করে।

৩। তাদেরকে মসজিদে জামাআত সহকারে নামায পড়তে উদ্বুদ্ধ

করুন। আপনি নামায পড়তে গেলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যান। বিশেষ করে তারাবীহর নামাযের জন্য আপনি তাকে সঙ্গী করুন। নামাযে অগ্রগতি দেখে তাকে কোন উপহার দিয়েও সন্তুষ্ট করতে পারেন।

৪। শিশুকে মানুষের মত মানুষরূপে গড়ে তুলতে কুরআন কারীমের তা'লীম দিন। আর এ কাজে তাকে অনুপ্রাণিত করতে নিম্নের নির্দেশাবলীর অনুসরণ করুন ঃ-

(ক) যে কুরআন খতম করবে তার জন্য একটি মূল্যবান পুরস্কার রাখুন।

(খ) প্রত্যহ পঠনীয় পাঠ ও তার সময় তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিন।

(গ) তাকে তাহফীযের হালকায় ভরতি করে দিন এবং তার সাথে আপনিও খোঁজ-খবর রাখুন।

(ঘ) রমযান মাসে হিফযের জন্য পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিন। আর সেই সাথে পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থা রাখুন।

(ঙ) যে অংশ মুখস্থ করবে তার ক্যাসেট শুনতে দিন। বিশেষ করে যদি কোন ছোট বাচ্চার কিরাআত হয়, তাহলে অবসর সময়ে তা বেশী বেশী করে শুনতে থাকুক।

৫। শিশুকে দান করতে অভ্যাসী করে তুলুন। দান এ মাসের একটি বড় ইবাদত। এই ইবাদতের গুরুত্ব তার কাছে তুলে ধরুন। তার হৃদয়-মনে গরীব-মিসকীনদের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত করুন। তার কথাবার্তায় বা ভাবে-ভঙ্গিতে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা বা গরীবদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পেলে তা তার মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করুন। আর এর জন্য নিম্নের নির্দেশাবলীর অনুসরণ করুন ঃ-

(ক) মাঝে-মধ্যে তাকে কিছু করে টাকা দিন, যাতে সে নিজ হাতে সঠিক জায়গায় দান করে। অবশ্য এ কাজে আপনার লক্ষ্য রাখা জরুরী।

(খ) কোন নির্দিষ্ট গরীবকে দান করতে হলে আপনি নিজ হাতে তা না করে আপনার ছেলের হাত দ্বারা করুন।

(গ) গরীবদেরকে অন্নদান করতে আপনার ছেলেকে পাঠান। আর এ কাজের মাহাত্ম্যের কথা তাকে জানিয়ে দিন।

(ঘ) অপরকে ইফতারী করাতে তার সহযোগিতা নিন।

৬। রোযার দিনে ছেলেদের জন্য উপকারী প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট করুন। যাতে তাদের রোযা পূর্ণ করা সহজ হয় এবং তাদের সময়ের অপচয়ও না হয়।

৭। সময়মত ঘুমানোর অভ্যাস তৈরি করুন।

৮। যে ছেলে ভালো চরিত্র ও ব্যবহার প্রদর্শন করে, তাকে সকলের সামনে পুরস্কৃত করুন।

৯। বাড়ির কাজে শিশুদেরকে অংশগ্রহণ করান। পিতার কাছে ছেলে এবং মাতার কাজে মেয়ে যেন সহযোগিতা করে। তাহলেই তারা কাজ শিখে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে প্রয়াস পাবে।

রমযান ও স্বাস্থ্য

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পানাহার না করে উপবাস থাকা আমাদের বর্তমান যুগেও চিকিৎসা-শাস্ত্রে এক প্রকার অবলম্বিত চিকিৎসা। আমাদের রোযাও এ অর্থে এক প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি।

প্রাচীন ও আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান রোযার বহুবিধ উপকারিতার কথা প্রমাণ করেছে। যে সকল উদ্দেশ্যে রোযা আমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে, সম্ভবতঃ তার মধ্যে এটিও একটি। এ ব্যাপারে একটি হাদীসও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। "তোমরা রোযা রাখ, সুস্থ থাকবে।" *(এ হাদীসটি সহীহ নয়। দেখুন ঃ যজাঃ ৩৫০৪, সিযঃ ২৫৩নং)*

অবশ্য এখানে একটি সতর্কতার বিষয় এই যে, মুসলিম রোযা রাখবে আল্লাহর আদেশে সাড়া দিয়ে তাঁর আনুগত্য করে। উপরন্তু স্বাস্থ্যগত যে উপকারিতা তাতে লাভ হবে, তা হবে আল্লাহর তরফ হতে এক শ্রেণীর প্রতিদান ও অনুগ্রহ। আমরা এখানে সহজভাবে রোযার স্বাস্থ্যগত উপকারিতার কথাই সংক্ষেপে আলোচনা করব - ইন শাআল্লাহ।

v রমযানের পূর্বে

সম্ভবতঃ একটি বিপরীতমুখী অনুধাবনের বহিঃপ্রকাশ এই যে, রমযান শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে অনেকেই এত বেশী পরিমাণে নানা ধরনের খাদ্য ও পানীয় ক্রয় করে থাকে, যা দেখে দর্শক মনে করবে যে, ওদের সামনে যে মাস আসছে তা রোযার নয়; বরং ভোজের মাস। আর

সম্ভবতঃ অনেক কারণের মধ্যে এটি এমন একটি কারণ, যার ফলে রোযা রোযাদারের জন্য বহু স্বাস্থ্যগত উপকারিতা হারিয়ে ফেলেছে।

অথচ আমরা যদি আমাদের রসূল ﷺ-এর রোযার মাস বরণ করার পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি ফিরাই, তাহলে অবশ্যই তাতে স্বাস্থ্যগত পদ্ধতিতে এ মাসের বরণ দেখতে পাব। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ শা'বান মাসে বেশী বেশী রোযা রাখতেন; দেখে মনে হতো এ মাস যেন রমযান মাস। *(বুখারী, মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ কেন এ মাসে এত বেশী রোযা রাখতেন সে ব্যাপারে নানা মত থাকলেও, তাতে স্বাস্থ্যগত উপকারিতা বর্তমান। আমরা জানি যে, পরিপাক যন্ত্র সূক্ষ্ম নিয়ম মাফিকভাবে কাজ করে। আর পানাহারের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে আকস্মিকভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য রোযা বা উপবাস অবস্থায় পরিবর্তিত হলে পরিপাক যন্ত্রে অনিয়ম ও গন্ডগোল সৃষ্টি হবে। এ জন্যই রোযার মাস শুরু হওয়ার পূর্বে দেহকে রোযার উপর ট্রেনিং দিয়ে নেওয়া কর্তব্য।

এ ব্যাপারে একটি ভিত্তিহীন হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, "পাকস্থলী রোগের ঘর। আর স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী বাছ-বিচার করে খাওয়া (Diet) হল সকল ঔষধের প্রধান। প্রত্যেক শরীরকে তার অভ্যাস অনুযায়ী জিনিস দাও।" *(সিযঃ ২৫২নং)*

v রোযার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা

মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের জন্য যে জিনিসই নিষিদ্ধ করেছেন, সেই জিনিসের ভিতরেই কোন না কোন ক্ষতি বা অপকারিতা বর্তমান

আছে এবং যে জিনিস আমাদের জন্য বৈধ ও বিধেয় করেছেন, তাতে একাধিক লাভ ও উপকারিতা অবশ্যই আছে; তা মানুষ জানতে পারুক, চাহে না-ই পারুক। এ ব্যাপারে রোযা হল উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নত হওয়ার সাথে সাথে আজ পর্যন্ত এই বিরাট ইবাদত রোযার একটার পর একটা উপকারিতা আবিষ্কার করেই চলেছে। আমরা যদি রোযার আবিষ্কৃত সকল উপকারিতার কথা লিপিবদ্ধ করতে চাই, তাহলে কয়েক খন্ডের গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন হবে। অবশ্য আমরা এখানে তার কিছু স্বাস্থ্যগত উপকারিতার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

তবে একটি সতর্কতার বিষয় এই যে, রোযার আশানুরূপ উপকারিতা লাভ করার জন্য সঠিক নিয়মানুযায়ী রোযা রাখতে হবে। নচেৎ বর্তমান কালের রোযা রাখার মত রাখলে - বিশেষ করে রাত্রে অপরিমিত ও অবাঞ্ছিত খাদ্য ভক্ষণ করলে সেই উপকার সাধন নাও হতে পারে।

রোযার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা নিম্নরূপ ঃ-

১। ক্ষতিকর পদার্থ থেকে মুক্তি

প্রাচীন কাল থেকেই এ কথা বিদিত যে, খাদ্যের বিষাক্ততা থেকে দেহকে পরিষ্কার করার জন্য রোযার একটি বৃহৎ ভূমিকা আছে। এ কথা অধুনা চিকিৎসা-বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে যে, উপবাস অবস্থায় দেহ তার সকল প্রকার ক্ষতিকর অতিরিক্ত পদার্থ মলাশয়, মূত্রগ্রন্থিদ্বয়, চর্ম, ফুসফুসদ্বয় এবং ন্যাসাল সাইন্যাস-এর মাধ্যমে বহিষ্কার করে থাকে।

২। দেহের ওজন হ্রাস

একাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় গবেষকরা এ কথা তাকীদের সাথে প্রমাণ করেছেন যে, যদিও বহু মুসলিম রমযানের পানাহারে ইসলামী স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম-নীতির অনুসরণ করে না, যদিও তারা রমযানী ডিশে নানান ফ্যাট ও মিষ্টি জাতীয় খাদ্য ব্যবহারে অপচয় করে থাকে, তবুও রমযানের রোযা ২ থেকে ৩ কিলো দেহের ওজন হ্রাস করতে সক্ষম হয়। খাদ্য গ্রহণ না করার প্রথম ১২-১৪ ঘন্টায় যে পরিমাণ গ্লুকুজ উপবাসের ফলে ধ্বংস হয়, মানুষের দেহ লিভারস্থ গ্লুকুজ সরবরাহ করে তার বিকল্প উপায় সৃষ্টি করে। এ ছাড়া দেহের মধ্যে যে অতিরিক্ত তৈলাক্ত পদার্থ পুড়ে নষ্ট হয়, তার ফলেও রমযান মাসে ইফতারীতে সুন্নাহর তরীকা গ্রহণ করার কারণে এবং অপরিমিত খাদ্য গ্রহণ না করার কারণে মাঝারি ধরনের ওজন-হ্রাস হয়ে থাকে। আবার ইফতারীর পর যখন তারাবীহর নামায পড়া হয়, তখন ওজন কম হতে আরো সহযোগিতা লাভ হয়। যেহেতু এক রাকআত নামাযে দেহ দশটি ক্যালোরি পুড়িয়ে ধ্বংস করে থাকে।

৩। দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের বিরতি

পানাহার থেকে বিরত থাকলে পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃৎ ও পিত্তকোষ বিরতি ও বিশ্রাম পায়। সুতরাং যকৃতের খাদ্য হজম করার কাজ বন্ধ থাকলে সেই বিষাক্ত পদার্থ থেকে রক্ত চলাচলের সিস্টেমকে পরিশুদ্ধ করে, যা আমাদের দেহকোষের অবিরত কর্মের ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন পাচনযন্ত্র (ডিজেস্টিভ সিস্টেম)এর বিরতি রক্ত চলাচলের সিস্টেমকে আমাদের দেহের অন্যান্য অঙ্গে খাদ্য

সরবরাহের কাজে লিপ্ত করে।

অনুরূপভাবে কিডনীর কাজ হল পাচনযন্ত্রের মাধ্যমে মিশ্রিত দূষিত পদার্থ থেকে দেহের রক্তকে শোধন করা। যখন রোযা এ কর্ম থেকে তাকে বিশ্রাম দেয়, তখন অন্যান্য উপকারী কর্মে সে ব্যস্ত হয়; যেমন দেহস্থ বিক্ষিপ্ত পদার্থ যেমন সোডিয়াম ও ক্যালসিয়ামকে সুবিন্যস্ত করে। যেমন রক্ত তৈরীর কাজে জরুরী ও উপকারী কিছু হরমোন প্রস্তুত করতেও শুরু করে। তদনুরূপ অস্থির পুষ্টিসাধনে উপকারী ভিটামিন ডি তৈরির কাজে সহযোগী হরমোন প্রস্তুতও করে থাকে।

৪। বিভিন্ন রোগ থেকে প্রতিরোধ সৃষ্টি

রক্তের সাথে মিশ্রিত তৈলাক্ত পদার্থ; যেমন কোলেষ্ট্রল থেকে রোযা রক্তকে শোধন করে। যে কোলেষ্ট্রল রক্তধমনির ভিতরে জমে উঠে কখনো কখনো তার চলার পথ বন্ধ করে ফেলে। এই হিসাবে রোযা ধমনি-প্রদাহ রোগ-নিবারণে একটি ফলপ্রসূ চিকিৎসা। আর এর ফলে হাইপ্রেসার রোগ থেকেও নিবারণ-ক্ষমতা লাভ হয়ে থাকে। যেমন রোযা ব্লাড-প্রেসারকে লো’ করে। ফলে এতে হাইপ্রেসারের রোগী উপকৃত হয়। আর তা হয় (নিরম্বু উপবাস) তরল পানীয় পান না করার ফলে দেহের ভিতরে যে সাময়িক শুষ্কতা সৃষ্টি হয় তার কারণে।

রক্তের মধ্যে শ্বেতকনিকার পরিমাণ বৃদ্ধি ও এ্যন্টিবডি পদার্থ সৃষ্টির মাধ্যমে রোগাদির অনাক্রম্যতায় রোযা বড় প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া লসিকা (লিম্ফেটিক) কোষের

ক্রিয়াগত সূচক প্রায় দশ গুণ উৎকৃষ্ট হয়ে যায়। যেমন কিছু গবেষণায় এ কথা প্রমাণিত যে, দেহকে স্ফীতি-কোষ থেকে মুক্ত করতে রোযার উপকারী ভূমিকা রয়েছে। যেহেতু উপবাস অবস্থায় উক্ত কোষ অধিকাংশ ধ্বংস হয়ে থাকে।

স্বাস্থ্যসম্মত সেহরী

অনেকের ধারণা এই যে, রমযানের প্রধান খাবার হল ইফতারীর খাবার। কিন্তু ডাক্তারগণ নিশ্চিতরূপে জানান যে, সেহরীর খাবারই হল গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান খাবার। যেহেতু এই খাবারই ক্ষুধার অনুভূতি দমন করে এবং রোযার উপবাস-কষ্ট সহ্য করতে সাহায্য করে।

ডাক্তারদের পূর্বে আমাদের মহানবী ﷺ এই খাবারের ব্যাপারে অনেকানেক তাকীদ করে গেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা সেহরী খাও। কারণ সেহরীতে বর্কত নিহিত আছে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

যেমন তিনি এই খাবারকে যথাসাধ্য পিছিয়ে খেতে অধিক তাকীদ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা আগে আগে ইফতার কর এবং সেহরী খাও দেরী করে।" *(সিসঃ ১৭৭৩নং)*

এ ছিল রোযাদারের প্রতি দয়ার নবী ﷺ-এর দয়া, তার স্বাস্থ্যের প্রতি সুনজর এবং অতিরঞ্জনের ছিদ্রপথ বন্ধ করার এক নির্দেশ।

নিয়মিত সেহরী খেলে দিনে ক্লান্তি ও মাথাব্যথা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কঠিন পিপাসার অনুভূতি হাল্কা করে দেয়। রোযা অবস্থায় প্রাত্যহিক সক্রিয়তার জন্য জরুরী শক্তি সঞ্চয় করে। আলস্য,

জড়তা ও ঘুম-ঘুম ভাব দূরীভূত করে। ক্যালোরী ধ্বংস হওয়ার ফলে যে মেদবৃদ্ধি রোগের সৃষ্টি হয়, তাও তাতে দূরীভূত হয়।

v সেহরীর ধরন

গবেষকরা নিশ্চয়তা দান করেন যে, সেহরীর খাবারে মূল শক্তি সঞ্চারক কার্বোহাইড্রেইট বা শ্বেতসার, ফ্যাট ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য থাকলে রোযা অবস্থায় ক্ষুধার অনুভূতি হ্রাস করে। যেহেতু প্রোটিন ও ফ্যাট হজম হওয়ার যথেষ্ট সময় হল ৬ থেকে ৯ ঘন্টা, কার্বোহাইড্রেইট ও বিশেষ করে যৌগিক শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য হজম হতে প্রায় ৪ থেকে ৬ ঘন্টা লাগে। সুতরাং এই সকল খাদ্য লম্বা সময় ধরে পাচনযন্ত্রে মজুদ থাকলে সূক্ষ্ম অন্ত্রের সক্রিয়তা বন্ধ থাকার ফলে ক্ষুধার অনুভূতি জাগতে দেয় না; যে অন্ত্র সাধারণতঃ পাচনযন্ত্র খাদ্যশূন্য থাকলে মস্তিষ্কের মধ্যভাগে অবস্থিত ক্ষুধার অনুভূতি-কেন্দ্রকে সক্রিয় করে তোলে।

ডাক্তারগণ ইঙ্গিত করেছেন যে, যৌগিক কার্বোহাইড্রেইট জাতীয় খাদ্য; যেমন ভাত, আলু, শস্যবীজ ও ম্যাকারোনি প্রভৃতির প্রভাব রক্তে ধীরে ধীরে পড়ে থাকে; সাধারণ শর্করা জাতীয় খাদ্যের মত তাড়াতাড়ি নয়। আর উক্ত খাদ্যের এই ধীর বিশোষণ এবং গ্লুকুজ-শর্করার ধীর প্রভাব রক্তে গিয়ে শৃঙ্খলিত অবস্থায় হয়। যার ফলে রোযা অবস্থায় রক্তের শর্করার মাত্রা একেবারেই হ্রাস পেয়ে যায় না।

সেহরীর খানা এমন হওয়া উত্তম, যা সহজে হজম হয়, যেমন দই জাতীয় খাদ্য, মধু, ফলমূল ইত্যাদি। এ সময় লবণাক্ত খাদ্য ভক্ষণ করা পছন্দনীয় নয়; যেমন আচার ও সির্কা জাতীয় খাদ্য, পনীর,

যয়তূন ইত্যাদি। তদনুরূপ অধিক মিষ্টি জাতীয় খাদ্য, বাদাম ও ডাল জাতীয় ভাজা খাদ্য, অধিক মসলা মিশ্রিত খাদ্য, চর্বি জাতীয় ও তেলে ভাজা খাদ্যও সেহরীতে না খাওয়া উচিত। কেননা এই শ্রেণীর খাদ্য কিছু পরেই প্রচন্ড পিপাসা সৃষ্টি করে। তাছাড়া এতে বদহজমও হতে পারে।

অনুরূপভাবে সেহরীতে চা পান করাও উচিত নয়। যেহেতু এর ফলে প্রস্রাবের চাপ বাড়ে। আর তার ফলে দেহ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তরল পদার্থ এবং সেই সাথে দেহের জন্য রোযা অবস্থায় প্রয়োজনীয় অজৈব লবণও নেমে যায়। যেমন সেহরীতে যথেষ্ট পরিমাণ পানি পান করা জরুরী; তবে মাত্রাতিরিক্ত পান করা উচিত নয়।

খাদ্য-বিশেষজ্ঞগণ জোর দিয়ে বলেন যে, সেহরীতে যথেষ্ট পরিমাণে ফল-মূল ও কাঁচা সব্জি (শসা ইত্যাদি) খাওয়া জরুরী। যেহেতু এ সবে আছে প্রয়োজনীয় অংশু, ভিটামিনসমূহ ও অজৈব পদার্থ। তাঁরা বলেন, এ সবের অংশু খাদ্যের সাথে পান কৃত পানি শোষণ করে থাকে এবং তার ফলে পাকস্থলী ও অন্ত্রসমূহ খাদ্যে পরিপূর্ণ থাকে; কিন্তু সে খাদ্য হয় স্বাভাবিক মাঝারি ধরনের অল্প ক্যালোরি বিশিষ্ট। আর এর অর্থ এই যে, চর্বি ও শর্করা জাতীয় খাদ্য ব্যবহার না করাই উচিত। যেমন অংশু-সমৃদ্ধ খাবার কোষ্ঠবদ্ধতা হাল্কা করতে সাহায্য করে।

স্বাস্থ্যসম্মত ইফতারী

বারো ঘন্টা পাচনযন্ত্রের বিশ্রামের পর ইফতারীর খাদ্য দ্বারা আহার কার্যক্রম শুরু হয়ে থাকে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরামর্শ অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণ করা রোযাদারের উচিত। আসুন নিম্নের উপদেশ গ্রহণ করে রোযায় আমাদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখি ঃ-

১। জলদি ইফতার করুন

আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে জলদি ইফতার করতে অসিয়ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "লোকেরা ততক্ষণ মঙ্গলে থাকবে, যতক্ষণ ইফতারে তাড়াতাড়ি করবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

সূর্যাস্তের পর দেরী না করে তাড়াতাড়ি ইফতার করায় স্বাস্থ্যগত ও মানসিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। যেহেতু রোযাদার যে পানি ও শক্তি দিনের বেলায় হারিয়ে ফেলেছে এই সময় তার পরিবর্তের অপেক্ষায় থাকে। আর ইফতারে দেরী করলে রক্তে শর্করার মাত্রা কম হয়ে যায়; যার ফলে অনেক সময় দুর্বলতা ও ক্লান্তির শিকার হতে হয়। বলাই বাহুল্য, এতে রয়েছে অকারণে আত্মক্লেশ; যাতে উদার শরীয়ত সম্মত নয়।

২। দুই পর্যায়ে ইফতার করুন

ইফতারীতে শীঘ্রতা করার সাথে সাথে মাগরেবের নামাযেও শীঘ্রতা করা আমাদের রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ। বলা বাহুল্য, ইফতারীতে বেশী

খেতে গেলে, মাগরেবের নামায দেরী হয়ে যাবে। আর এ জন্যই প্রথমে কিছু খাদ্য গ্রহণ করে নামায পড়া এবং তারপর ইফতারীর বাকী খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত। যেহেতু এতে রয়েছে বড় যৌক্তিকতা। পাকস্থলীতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ খাদ্য পাঠিয়ে সামান্যক্ষণ বিরতি দেওয়া পাকস্থলী ও অন্ত্রের জন্য এক প্রকার সতর্কবার্তা। এতে পিপাসা ও ক্ষুধার অনুভূতি দূরীভূত হয়। অতঃপর রোযাদার নামায পড়ে ফিরে এসে বাকী ইফতার পূর্ণ করবে; যখন তার পেটে ক্ষুধার জ্বালা থাকবে না।

আর এ কথাও বিদিত যে, এক সাথে তাড়াহুড়া করে বেশী পরিমাণে খাদ্য গলাধঃকরণ করার ফলে পাকাশয় ফুলে উঠতে পারে অথবা বদহজম হতে পারে। তাছাড়া এর ফলে সৃষ্টি হবে জড়তা, আলস্য ও তন্দ্রা। যেহেতু এই সময় অনেক পরিমাণের রক্ত পাচনযন্ত্রে পাচনকাজে সহযোগিতার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে। আর তার ফলে বহু সক্রিয় দেহাঙ্গে বিশেষ করে মস্তিষ্কে রক্তস্বল্পতা সৃষ্টি হয়।

৩। ইফতারীর পর ঘুমাবেন না

কিছু লোক উদরপূর্তি করে ঘুমের কোলে আশ্রয় নেয়। অথচ ফ্যাট জাতীয় মাত্রাধিক পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করার পর ঘুমানোর ফলে মানুষের জড়তা ও আলস্য বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এই সময় একটু গা-গড়া দেওয়া বা শুয়ে দেহটাকে শিথিল করা ক্ষতিকর নয়।

সুতরাং এই শ্রেণীর লোকেদের জন্য সোনালী উপদেশ এই যে, ইফতারীতে মাঝামাঝি ধরনের পরিমিত পানাহার করুন অতঃপর

যথারীতি এশা ও তারাবীহর নামায পড়ুন। এর ফলে আপনার খানা হজম হয়ে যাবে এবং দেহের মধ্যে স্ফূর্তি ও প্রাণময়তা অনুভব করবেন।

৪। খেজুর দিয়ে ইফতারী করুন

আনাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ নামাযের পূর্বে কিছু আধা-পাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তা না পেলে পূর্ণ পাকা (শুকনা) খেজুর দিয়ে এবং তাও না পেলে কয়েক ঢোক পানি খেয়ে নিতেন।' *(আঃ ৩/১৬৪, আদাঃ ২৩৫৬, তিঃ ৬৯৬, ইমাঃ ২০৬৫, দারাঃ ২৪০, হাঃ ১/৪৩২, বাঃ ৪/২৩৯, ইগঃ ৯২২নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ অন্যান্য খাবার ছেড়ে উক্ত খাবার পছন্দ করলেন, কারণ তাতে ছিল স্বাস্থ্যগত উপকার। শুধু এই জন্য নয় যে, মরু-পরিবেশে তা সহজলভ্য ছিল।

বলা বাহুল্য, রোযাদার ইফতারীর সময় এমন খাদ্যের মুখাপেক্ষী, যা সত্বর হজম হবে এবং দেহে সত্বর বিশোষিত হবে। আর তার ফলে তার ক্ষুৎ-পিপাসা দূরীভূত করবে। মস্তিষ্কের কোষকে শর্করা দ্বারা সমৃদ্ধ করবে। যেহেতু দেহের মধ্যে কেবল এই কোষই প্রয়োজনে শর্করা সৃষ্টি করে না; অথচ সেটাই তার প্রধান আহাররূপে পরিগণিত।

খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে যে খাদ্যের হজম ও বিশোষণ সবচেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি হয়, তা হল সিঙ্গেল বা ডবল শর্করাযুক্ত খাবার। আর সদ্যপক্ক খেজুর ছাড়া এই শ্রেণীর খাদ্যের অন্য কোন উদাহরণ নেই। যেমন পাকা ও আধপাকা খেজুর অংশু দ্বারা সমৃদ্ধ থাকে এবং তার ফলে কোষ্ঠবদ্ধতা থেকে রেহাই দেয়। মানুষকে এই অনুভূতি দেয়

যে, তার পেট পূর্ণ আছে। আর তার ফলে রোযাদার বেশী আহার গ্রহণ করবে না।

যেমন খেজুরের সাথে সাথে অথবা খেজুর না পাওয়া গেলে পানি পান করতে হবে। যাতে দেহে তরল পদার্থের প্রয়োজন মিটাতে পারে।

৫। ইফতারী খাদ্যের ধরন ও পরিমাণ

চেষ্টা করুন, যাতে আপনার ইফতারীর খানা বিভিন্ন ধরনের হয় এবং তাতে সর্বপ্রকার খাদ্য-উপাদান বর্তমান থাকে। সুতরাং তাতে যেন যৌগিকভাবে ৪ জাতের খাদ্য থাকে; শ্বেতসার জাতীয়, দুগ্ধ জাতীয়, ফলমূল ও সব্জি জাতীয় এবং মাংস জাতীয়। এর মধ্যে এক জাতের খাদ্য যথেষ্ট মনে করা উচিত নয়।

আপনার এই খাবারে যথেষ্ট পরিমাণে স্যালাড রাখুন। যেহেতু তা হল অংশুসমৃদ্ধ খাদ্য। যেমন এই খাবার গ্রহণের ফলে আপনি পেট-পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তির অনুভূতি পাবেন।

সুতরাং পরিমাণে কম খাদ্য গ্রহণ করুন এবং যথাসাধ্য মসলাজাতীয় ও আচার বা সির্কাজাতীয় খাবার থেকে দূরে থাকুন। যেমন ভাজাভুজি থেকেও দূরে থাকা উত্তম। কারণ তাতে বদহজম ও অজীর্ণ সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য এই সময় বেশী পরিমাণে তরল পানীয় (পানি, শরবত, জুস ইত্যাদি) পান করা দরকার। যাতে রোযা অবস্থায় প্রয়োজনীয় তরল পদার্থের পরিবর্ত হতে পারে এবং কিডনীকে তার ভূমিকা পালনের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

আবারো বলি যে, পেটুকের মত উদরপূর্তির ফলে পাকস্থলী স্ফীত হতে পারে, অজীর্ণ ও বদহজম হতে পারে। আর এর

অনুভূতি পেট ফুলা, পাঁজরের নিচে ব্যথা, পেটে গ্যাস সৃষ্টি এবং দেহ ঢিলে হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এ ছাড়া এর ফলে সৃষ্টি হয় জড়তা, আলস্য ও তন্দ্রা।

মহানবী ﷺ বলেন, "উদর অপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোন পাত্র মানুষ পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের জন্য ততটুকুই খাদ্য যথেষ্ট যতটুকুতে তার পিঠ সোজা করে রাখে। আর যদি এর চেয়ে বেশী খেতেই হয়, তাহলে সে যেন তার পেটের এক তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানের জন্য এবং অন্য আর এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ব্যবহার করে।" *(তিরমিযী ২৩৮০, ইবনে মাজাহ ৩৩৪৯, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/ ১২ ১, সহীহুল জামে' ৫৬৭৪নং)*

রোগী ও রোযা

বান্দার প্রতি আল্লাহর একটি রহমত এই যে, তিনি রোগীকে রোযা বিলম্ব ও কাযা করার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر)

অর্থাৎ, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ বা মুসাফির হলে সে অপর কোন দিন গণনা করবে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত)*

সুতরাং কোন বিশ্বস্ত ও মুসলিম ডাক্তার যদি বলেন, আপনি রোযা রাখলে আপনার রোগ বৃদ্ধি পাবে অথবা আপনি মারা যেতে পারেন, তাহলে আপনার জন্য রোযা রাখা বৈধ নয়।

রমযান মাস আসতেই রোযার প্রভাবে কিছু মানুষের কোন কোন রোগ

বৃদ্ধি হয়। আর তার জন্যই তাদেরকে নির্দিষ্ট নির্দেশনামা মেনে চলতে হয়। আমরা এখানে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ রোযার রোগীদের জন্য বর্ণনা করব। তবে রোগীর রোযা রাখা ও না রাখার ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা থাকবে রোগের চিকিৎসাকারী ডাক্তারের হাতে। যেহেতু তিনিই তাঁর রোগী ও চিকিৎসা সম্বন্ধে ভালো জানবেন এবং তিনিই রোগীকে উপযুক্ত উপদেশ, নির্দেশ ও পথ্য প্রদান করবেন।

ডায়াবেটিস বা সুগারের রোগী

সুগারের সকল রোগীই এক শ্রেণী, এক পর্যায় ও একই জটিলতার শিকার হন না। আর এই জন্যই তাদের প্রত্যেকের চিকিৎসার পদ্ধতিও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে; যদিও প্রত্যেক পদ্ধতির প্রধান লক্ষ্য হল, রক্তের শর্করা যাতে অতিরিক্ত বৃদ্ধি বা হ্রাস না পেয়ে বসে।

যে রোগীরা প্রথম শ্রেণীর (শিশুদের) ডায়াবেটিস রোগ ভোগ করে এবং যারা তাদের চিকিৎসায় শৈশব হতেই ইন্সুলিনের উপর ভরসা করে থাকে, ডাক্তারগণ তাদেরকে রোযা না রাখতে উপদেশ দিয়ে থাকেন। যেহেতু তারা রোযা রাখলে এমন জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে, যার পরিণাম ভালো নয়। যেমন রক্তে সুগার লো বা হাই হওয়ার কারণে বেহুঁশ হয়ে পড়তে পারে।

অনুরূপভাবে যে সকল মহিলা প্রথম শ্রেণীর ডায়াবেটিস অথবা কেবল গর্ভাবস্থায় সুগার রোগ ভোগ করে তাদেরকেও রোযা না রাখতে উপদেশ দেওয়া হয়। বিশেষ করে যেসব মহিলারা প্রত্যহ একাধিকবার ইন্সুলিন ব্যবহার করে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে গর্ভিণী ও

গর্ভস্থ ভ্রূণ উভয়েরই ক্ষতির আশঙ্কা আছে। তবে গর্ভাবস্থায় সুগারের প্রত্যেক অবস্থাতেই যে মহিলা ইন্সুলিন ব্যবহারের সাথে সাথে রোযা রাখতে পারবে না, তা নয়। বিশেষ করে ইঞ্জেকশন যদি দিনে একবার হয়, তাহলে তাতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর (সাবালক) ডায়াবেটিস রোগী, যারা কোন জটিলতার শিকার হয় না; যেমন যারা কিডনী ইন্ফেকশন বা হার্টের রোগ ভোগে না, তাদের রোযা রাখায় কোন বাধা নেই। অবশ্য এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ জরুরী।

ডায়াবেটিস রোগী রমযানে দুই অবস্থার শিকার হতে পারে; লো সুগার ও হাই সুগার। আর উভয়ের সরাসরি সম্পর্ক ভক্ষিত আহার, ব্যবহৃত ঔষধ ও কায়িক পরিশ্রমের সাথে। সুতরাং যে রোগী রোযা রাখা অবস্থায় তার চিকিৎসায় ইন্সুলিনের উপর নির্ভর করে তার সুগার বারবার লো হতে থাকে। আর এ রোগ (লো সুগার) হাই সুগার অপেক্ষা রোগীর জীবনের জন্য বেশী বিপজ্জনক।

বিশেষ করে রোযা অবস্থায় ইন্সুলিন ব্যবহারকারী ডায়াবেটিস রোগীর রক্তে সুগার লো হয় নিম্নলিখিত কোন একটি কারণে ঃ-

১। ইন্সুলিনের মাত্রা বেশী অথবা সুগার কমানোর ট্যাবলেট বেশী ব্যবহার।

২। চিকিৎসা লাভের পর রোগীর নিজের খাবার দেরী করে খাওয়া অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণের তুলনায় কম খাওয়া।

৩। ইন্সুলিন ব্যবহার করার সময় ইফতারী ও সেহরীর মাঝে নির্দিষ্ট হাল্কা আহার গ্রহণ বর্জন করা।

৪। রোযা থাকা অবস্থায় অতিরিক্ত স্নায়বিক বা মানসিক উত্তেজনা বা টেনশনের শিকার হওয়া অথবা লম্বা সময় ধরে অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রম করা।

ইন্সুলিনের উপর নির্ভরশীল সুগারের রোগীরা নির্দিষ্ট শর্তে রমযানের রোযা রাখতে পারে ঃ-

১। রোগীর স্বাস্থ্যগত অবস্থা রোযার পূর্বে আপাত সুস্থ থাকতে হবে এবং রোগী তার রক্তে সুগারের পরিমাণ কন্ট্রোল করতে ও প্রায় স্বাভাবিক করতে সক্ষম হবে।

২। রোগী যেন রোযা অবস্থায় বারবার লো সুগার, ডায়াবেটিস কেটু এ্যাসিডোসিস অথবা অন্য কোন ভয়ানক জটিলতার শিকার না হয়।

৩। রোগী যেন তার চিকিৎসায় অধিক পরিমাণে (৪০ ডোজের বেশী) ইন্সুলিন ব্যবহার না করে।

অধিকাংশ ডাক্তারগণ এ কথা অধিক পছন্দ করেন যে, ডায়াবেটিস রোগী যেন রমযানে ব্যবহার্য ইন্সুলিনের পরিমাণে পূর্ব থেকে কোন মৌলিক পরিবর্তন না ঘটায়।

মোটকথা, যে ডাক্তার চিকিৎসা করছেন তিনিই রোগীর বর্তমান স্বাস্থ্য, তার কাজের প্রকৃতি ও ইফতার-সেহরীর মাঝে খাদ্যের পরিমাণ লক্ষ্য করে ইন্সুলিনের প্রকার ও প্রয়োজনীয় মাত্রা নির্ধারণ করবেন, যাতে তার রক্তের সুগার স্বাভাবিক (Normal) সীমার কাছাকাছি থাকে। আর এ জন্যই এ ব্যাপারে চিকিৎসাকারী ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরী। কেবল কিছু পড়ে বা শুনে তার উপর ভরসা করে তা সরাসরি কার্যকর করতে যাওয়া মোটেই উচিত নয়।

v পানাহার সম্পর্কীয় কিছু উপদেশ

১। ডায়াবেটিস রোগীর পানাহার পথ্যে যে খাবার থাকা দরকার, তাতে পরিপূর্ণ ক্যালোরীর মধ্যে থাকবে ৫০-৫৫% কার্বোহাইড্রেইট, ৩০-৩৫% ফ্যাট, ১০- ১৫% প্রোটিন।

রোগীর জন্য উক্ত খাবারের পরিমাণ, নির্দিষ্ট সময় এবং ইফতারী ও সেহরীর মাঝে কতবার খাবে তার নিয়ম মান্য করা জরুরী। সুতরাং সে তার খাবারকে তিনভাগে সমান সমান ভাগ করে নেবে। প্রথমভাগ ইফতারে, দ্বিতীয়ভাগ তারাবীহর পরে এবং তৃতীয়ভাগ সেহরীতে ভক্ষণ করবে। যথাসাধ্য সেহরীর খাবার তার শেষ সময়ে খাবে। পানি বেশী পরিমাণে পান করবে।

২। রোযার মাসে রোগীর কাছে তার পছন্দনীয় খাবারের রুটিন থাকা উচিত, যা সে পরিবর্তন করে সারা মাস খেতে পারে।

৩। পথ্য অনুযায়ী চর্বির পরিবর্তে খাদ্যে তেল (ভেজিটেবল অয়েল) ব্যবহার করা রোগীর জন্য উত্তম।

৪। খাবারে বেশী লবণ খাবেন না অথবা বেশী লবণাক্ত খাদ্য গ্রহণ করবেন না। কারণ এর প্রতিক্রিয়ায় হার্টের রোগ বা রক্ত চলাচলের কোন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৫। মিষ্টিজাতীয় কোন খাবার খাবেন না; যেমন ফলের জুস, মধু, মোরব্বা, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি। কারণ এতে রক্তে সুগার খুব বেশী বৃদ্ধি পেতে পারে। যথাসম্ভব তেলে ছাঁকা কোন খাবার (সিঙ্গারা, চপ, পিঁয়াজি ইত্যাদি) কম খান। কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরী আছে। এর পরিবর্তে তেলবিহিন ওভেনে পাকানো বা

সেঁকা খাবার খান।

৬। পটাসিয়ামযুক্ত খাবার সুগারের রোগীর জন্য সাধারণতঃ উপকারী; যেমন আলু, তাজা কমলা লেবুর রস ও কলা ইত্যাদি। যেমন কাঁচা পাতা (কফি, লেটুস, পার্সলি ইত্যাদি) সব্জিও বেশী বেশী খাওয়া উচিত। কারণ তাতেও প্রচুর পরিমাণে উক্ত পদার্থ মজুদ আছে। রোগীর প্রস্রাবের সাথে তা নেমে যায় বলে এই শ্রেণীর খাদ্য তার বিকল্প ব্যবস্থা। অবশ্য খাদ্যে ক্যালোরীর কথা খেয়াল রাখতেই হবে।

৭। যে রোগী অবিরত ইন্সুলিন ব্যবহার করে তার উচিত, পকেটে সব সময়কার জন্য কিছু পরিমাণ মিষ্টি জাতীয় কিছু (চকলেট ইত্যাদি) রেখে নেওয়া। যাতে সুগার লো হওয়ার উপসর্গ দেখা দিলে সাথে সাথে তা ভক্ষণ করবে ও রোযা ভেঙ্গে ফেলবে।

৮। সুগার লো হওয়ার ফলে রোগী জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লে তাকে চিনির শরবত খাইয়ে হাসপাতাল নিয়ে যান।

কিডনি ফেইলিয়র রোগ

স্থায়ী কিডনি ফেইলিয়র রোগে কখনো কখনো রোযা উপকারী চিকিৎসারূপে প্রমাণ হতে পারে; যেহেতু সে সময় প্রোটিন ও লবণাক্ত পদার্থ হ্রাস পেয়ে থাকে। অবশ্য এটি এ রোগের নির্দিষ্ট অবস্থায় ফলপ্রসূ হতে পারে। পক্ষান্তরে রোযা অবস্থায় দেহ থেকে তরল ও লবণাক্ত পদার্থ হ্রাস পাওয়ার ফলে উল্টা কিডনির অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং রোযা রাখা ও না রাখার

ব্যাপারে এমন রোগীকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

অবশ্য কিডনি ফেইলিয়র রোগের শেষ পর্যায়ের রোগী, যে dialyses-এর মাধ্যমে চিকিৎসা করে, তার রোযা তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। তবে যে কয়দিন ঐ dialyses চিকিৎসা করবে, সে কয়দিন রোযা কাযা করবে; যদি তা দিনে হয়। যেহেতু তাতে স্যালাইন লাগে এবং তাতে রোযা নষ্ট হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে যে রোগীর নিজস্ব কিডনি তুলে ফেলে অন্যের কিডনি সংযোগ করা হয়েছে, সেই রোগীর প্রথম বছরে রোযা রাখা উচিত নয়; যেমন এ কথা সঊদী আরবের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একাধিক গবেষণায় জানা গেছে। অবশ্য কিডনি সংযোগের এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর রোযা রাখতে পারে; যদি সেই কিডনি ঠিকমত কাজ করে তাহলে। এ ক্ষেত্রে রোগী ১২ ঘন্টা পর ইফতারীর পরে এবং সেহরীর সময় ওষুধ ব্যবহার করতে পারে।

কিন্তু যে রোগীর সংযুক্ত কিডনি ঠিকমত কাজ করে না, রোযা সে রোগীর জন্য এবং তার ঐ কিডনির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। সুতরাং এমন রোগীর রোযা পালনের পূর্বে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।
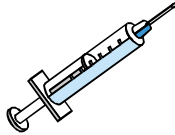
হাইপ্রেসারের রোগী

হাইপ্রেসারও একটি প্রচলিত রোগ। চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণার মাধ্যমে যা দেখা গেছে তার সারসংক্ষেপ এই যে, অন্য কোন জটিলতা না থাকলে হাইপ্রেসারের রোগীর রোযা পালন করতে কোন বাধা নেই। অবশ্য এ রোগীর জন্যও রোযা অবস্থায় কিঞ্চিৎ উপদেশ মেনে চলা দরকার। আর তা নিম্নরূপ ঃ-

১। ইফতারের পর থেকে সেহরীর শেষ সময় পর্যন্ত খাবারে পানীয় বেশী বেশী পান করা জরুরী। যাতে পরদিন দেহে পানির অভাব না ঘটে এবং তার ফলে কোন জটিলতা সৃষ্টি না হয়।

২। সেই খাদ্য ও পানীয় ব্যবহার করবেন না, যাতে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাট ও কফিজাতীয় উপাদান আছে। যেমন ঝাঁঝালো পানীয় (পেপসী ইত্যাদি) পান করাও উচিত নয়।

৩। যে রোগী দৈনিক ২ বারের অধিক অথবা প্রস্রাববাহী ওষুধ ব্যবহার করে তার উচিত, ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে চিকিৎসার পদ্ধতি পরিবর্তন করে রোযা রাখা।

হার্টের রোগী

এই রোগের বহু রোগীই রোযা রাখতে সক্ষম। যেহেতু রোযার দিনে হজমের কাজ বন্ধ থাকে। আর তার ফলে হার্টের কাজও কম হয়ে যায়। কারণ হার্ট যে রক্ত সারা দেহে সঞ্চালন করে তার ১০ শতাংশ যায় হজমযন্ত্রে; যখন তা হজমের কাজে সক্রিয় থাকে।

অনুরূপভাবে (Angina) কণ্ঠনালী প্রদাহের রোগী চিকিৎসার সাথে রোযা পালন করতে পারে।

পক্ষান্তরে কিছু হার্টের রোগী কোন কোন অবস্থায় রোযা রাখতে পারে না। যেমন, thrombosis, heart failure, (myocardial) infarction প্রভৃতি রোগগ্রস্ত রোগী।

মেদ ও ওজনবৃদ্ধির রোগ

আদর্শ ওজন অপেক্ষা ২০% ওজন বৃদ্ধি পেলে এই রোগ হয়। নিয়মিত আহার-ব্যবস্থা অনুসরণের সাথে রোযা ২ থেকে ৪ কিলো ওজন হ্রাস করতে সহযোগিতা করবে। অবশ্য এ রোগীকে শ্বেতসার জাতীয় আহার ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়। যেমন দূরে থাকতে বলা হয় তেল ও চর্বি-প্রধান খাদ্য গ্রহণ করা হতে। আর উপদেশ দেওয়া হয় বেশী বেশী অংশু-সমৃদ্ধ কাঁচা সব্জির স্যালাড খেতে।

গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী

মহান আল্লাহ বিশেষ করে গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মহিলাকে রোযা কাযা করার অনুমতি দিয়েছেন; চাহে সে নিজের উপর কষ্টের অথবা তার ভ্রূণ ও শিশুর উপর ক্ষতির আশঙ্কা করে হোক।

এই শ্রেণীর মহিলা দুই প্রকার হয়ে থাকে। এক প্রকার মহিলা; যারা এ অব্যাহতি গ্রহণ না করে কষ্টের সাথে রোযা পালন করে। আর দ্বিতীয় প্রকার মহিলা; যারা কেবল গর্ভবতী বা দুগ্ধদাত্রী হওয়ার ফলেই অব্যাহতি গ্রহণ করে রোযা কাযা করে থাকে। উক্ত উভয় প্রকার মহিলারাই কিন্তু ভুল করে থাকে। সুতরাং মধ্যবর্তী একটি পথ অবলম্বন করা উচিত এবং এ ব্যাপারে হিতাহিত বুঝে না এলে ডাক্তার তথা শরীয়তের মুফতীগণের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

যাই হোক, দুগ্ধদাত্রী মহিলা রোযা রাখলে তার উচিত, ইফতারীর পর অধিক পরিমাণে পানীয় পান করা। উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে তাকে সতর্ক হতে হবে। ইফতারী ও সেহরীর মধ্যবর্তী সময়ে বেশী পরিমাণে ফল-মূল, টাটকা শাক-সব্জি খাবে। রোযার দিনেও শিশুকে নিয়মিত দুধ পান করাবে। অতঃপর যদি সে নিজেকে দুর্বল ও ক্লিষ্ট বোধ করে, তাহলে রোযা রাখা ও না রাখার ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করবে। যেমন গরমের সময় শিশুকেও স্তন দানের সাথে সাথে পানি ইত্যাদি পানীয় পান করাবার চেষ্টা করবে। ইফতারী ও সেহরীর মধ্যবর্তী সময়ে শিশুকে বেশী বেশী স্তনের দুধ পান করাবে।

পক্ষান্তরে গর্ভবতী মহিলার রোযা রাখায় কোন সমস্যা নেই। ইফতারী ও সেহরীর তৃপ্তিপূর্ণ দুই টাইমের খাবার তার জন্য ও তার ভ্রূণের জন্য যথেষ্ট; চাহে সে গর্ভের প্রথম মাসগুলিতে থাক অথবা শেষের মাসগুলিতে।

বাস্তবে আমরা দেখি যে, গর্ভবতী মহিলার শুরুর দিকে অরুচি (আরুচ) করে, তখন ঘন ঘন বমি হওয়ার ফলে তার পেটে কিছু অবশিষ্ট থাকে না, অথচ তার কোন ক্ষতি হয় না। সুতরাং রোযা রাখলেও কোন ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। আর গর্ভের শেষের দিকে - বিশেষ করে নবম মাসে - ভ্রূণের আকৃতি পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং সে সময় গর্ভবতী বেশী খাদ্য গ্রহণের মুখাপেক্ষিণীও থাকে না। বরং এই সময়ের গর্ভবতীদেরকে বেশী পরিমাণে শ্বেতসার ও মিষ্টি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়ে থাকে, যাতে ভ্রূণের ওজন স্বাভাবিকতা থেকে বেশি বেড়ে না যায়।

কিছু গর্ভবতীর ধারণা যে, রোযা অবস্থায় - বিশেষ করে গর্ভের শেষের দিকে - ভ্রূণের নড়াচড়া কম হয়ে যায়। অথচ এ সময় কখনো কখনো এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে শর্ত হল, ভ্রূণের হৃদ্-স্পন্দন যেন স্বাভাবিক থাকে।

পরিশেষে বলি যে, গর্ভবতী বা দুগ্ধদাত্রী যে কোনই মহিলা রোযা রাখবে কি না, সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে যেন ভুল না করে। মহান আল্লাহ যখন আমাদের সুবিধার্থে রোযা রাখায় অব্যাহতি দিয়েছেন এবং অন্য সময় তা কাযা করার সুযোগ রেখেছেন, তখন আমরা নিজেদের প্রতি অসুবিধা ও কষ্ট আনয়ন করব কেন?

ধূমপান বর্জনের সহযোগিতায় রোযা

রমযান মুবারক এমন একটি মাস; যাতে রয়েছে ধর্মভীরুতা, চরিত্রগঠন এবং ভালোর দিকে পরিবর্তনের তরবিয়ত। মন্দ চরিত্র, বদ অভ্যাস ও কুকর্ম বর্জন করতে একটি বড় সহযোগী মৌসম। রমযান যেন জীবনের সকল ভুল থেকে সঠিকতার দিকে দিগ্‌দর্শন করে। জীবনকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার জন্য এবং বিশৃঙ্খলা, বিরক্তিকর এক ঘেয়েমি ও জড়তা থেকে বাঁচার জন্য রমযান একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যেমন রমযান এমন একটি প্রাক্টিকেল ট্রেনিং ফিল্ড্। এর মাধ্যমে মুসলিম নিজের চাল-চলন, আচার-আচরণ ও চিন্তা-চেতনাকে সুন্দর করে নিতে পারে। কিছু অভ্যাস, প্রথা ও স্বভাব-প্রকৃতির ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করতে পারে। এর মাধ্যমে মুসলিম নিজের বৈয়াক্তিক ইচ্ছা-শক্তিকে সুদৃঢ় করার পদ্ধতি শিক্ষা করতে পারে। শিখতে পারে প্রত্যেক কর্মে এই অনুভূতির কথা যে, মহান আল্লাহ তার কর্ম সূক্ষ্মভাবে পরিদর্শন করছেন।

ধূমপান করা মানুষের একটি খারাপ আচরণ ও বদ অভ্যাস। দ্বীনে ইসলামে এর বৈধতার স্বীকৃতি নেই। সুস্থ বিবেকও এর স্বীকৃতি জানায় না। ধূমপানে যে স্বাস্থ্যগত, মানসিক ও অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি আছে, তা গুনে শেষ করা যায় না।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণা এ কথা প্রমাণ করেছে যে, ধূমপানের

সাথে ফুসফুসের ক্যানসার, সিরৌসিস, করান্যারি, অ্যানজাইনা, মুখগহ্বর, গলবিল, স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীর ক্যানসার এবং আরো অনেক রোগের গভীর সম্পর্ক আছে।

পরিসংখ্যানের প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, এই ধূমপানজনিত রোগের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর শিকার হচ্ছে; যাদের বয়স ৩৪ থেকে ৬৫ বছর। ধূমপানের এই সর্বনাশী ক্ষতির হাত হতে মায়ের পেটের ভ্রূণ পর্যন্ত রক্ষা পায় না!

ধূমপান থেকে বাঁচার উপায়

এমন একটি সর্বনাশী ক্ষতিকর কুঅভ্যাস থেকে বাঁচা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজেব। অথচ অনেকের পক্ষে তা সুকঠিন। কিন্তু আপনি যদি নিম্নের উপদেশ গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার পক্ষে ধূমপানের বদ অভ্যাস বর্জন সহজ হবে ইন শাআল্লাহ।

১। মনে মনে দৃঢ়সংকল্প করুন ও স্থির সিদ্ধান্ত নিন যে, সত্যই আপনি ধূমপান ত্যাগ করতে চান।

২। ধূমপান ত্যাগ শুরু করার একটি নিকটবর্তী সময় নির্দিষ্ট করুন। আর এ ব্যাপারে গয়ংগচ্ছ করবেন না; যাতে আপনার ব্যক্তিত্ব ও সিদ্ধান্তে কোন প্রভাব না পড়ে।

৩। এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। তাঁর কাছে দুআ করুন, যাতে তিনি আপনাকে আপনার সিদ্ধান্ত পালনে শক্তি ও তওফীক দেন। মহানবী ﷺ বলেন, "সাহায্য চাইলে, আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও।" *(আঃ, তিঃ, হাঃ)*

৪। মনের মুকুরে সর্বদা ধূমপানের সর্বগ্রাসী অপকারিতা প্রত্যক্ষ করুন। স্মরণ করুন যে, মহান সৃষ্টিকর্তা আপনাকে আপনার স্বাস্থ্য, আয়ু ও ধন সম্পর্কে কিয়ামতে প্রশ্ন করবেন।

৫। এ কাজে আপনার একটি ধূমপায়ী সাথী (কোন আত্মীয়, বন্ধু, সহপাঠী বা সহকর্মী) খোঁজ করুন। যাতে উভয়েই এক সাথে ধূমপান বর্জন করার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। এতে আপনি কল্যাণের আশা বেশী করতে পারবেন। ধূমপান ত্যাগ করার ব্যাপারে মনের ভিতরে অধিক তাগাদা পাবেন। মানুষ একা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একজন অপরজনকে পরিপূর্ণ করে। আর মহান আল্লাহ বলেন,

{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}

অর্থাৎ, সৎকাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। *(সূরা মাইদাহ ২ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ভালোর সন্ধান দেয়, সে ব্যক্তি ভালো কাজ সম্পন্নকারীর মতই সওয়াব লাভ করে।" *(তিঃ)*

৬। সেই সাথী-বন্ধু থেকে সতর্ক থাকুন, যারা ধূমপান বর্জন করতে আপনাকে বাধা দেয়। আর মহানবী ﷺ-এর এই হাদীসকে আপনার মনের মণিকোঠায় স্থান দিন; তিনি বলেছেন, "মানুষ তার বন্ধুর ধর্মাবলম্বী হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকে যেন লক্ষ্য করে দেখে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে?" *(আঃ, আদাঃ, তিঃ)*

৭। আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপনার স্ত্রী, পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবকে অবহিত করুন। ইন শাআল্লাহ গুরুত্বের সাথে তারা

এ কাজে আপনার সহযোগিতা করবে।

৮। আপনার সিদ্ধান্ত পালনের ব্যাপারে রোযার সহযোগিতা নিন। মহান আল্লাহর অধিক নিকটে হন, আপনার সকল কাজে তাঁকে প্রত্যক্ষদর্শী বলে দৃঢ় প্রত্যয় রাখুন। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٧) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তুমি কি অনুধাবন কর না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন, তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না; যাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না; যাতে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি থাকেন না। তারা এ অপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক তারা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ (জ্ঞানে) তাদের সঙ্গে আছেন। তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত। *(সূরা মুজাদালাহ ৭ আয়াত)*

৯। স্মরণ করুন, আপনি পবিত্র রোযার মাসে রোযা পালন করছেন। আর তার দাবী এই যে, আপনি সকল প্রকার নোংরা, অপবিত্র ও ঘৃণিত জিনিস বর্জন করবেন। নিঃসন্দেহে বিড়ি-সিগারেট এক প্রকার অপবিত্র ও নোংরা জিনিস এবং তাতে যে সকল অপকারিতা রয়েছে, তার জন্যও তা বর্জন করা ওয়াজেব।

মহান আল্লাহ বলেন,

(وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)

অর্থাৎ, সে (নবী) তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তুসমূহকে অবৈধ করে। *(সূরা আ'রাফ ১৫৭ আয়াত)*

১০। জেনে রাখুন যে, যে ইচ্ছাশক্তি ও সংকল্পের দৃঢ়তা রোযা রাখায় তথা পানাহার ও যৌনাচার ইত্যাদি বর্জনে আপনার মনের ভিতরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, সেটাই আপনাকে ধূমপান থেকে বিরত রাখতে এবং তা বর্জন করার ফলে ঘটিত প্রতিক্রিয়া লাঘব করতে বড় ধরনের সহযোগিতা করবে। অতএব আপনি নামায ও ধৈর্যের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং রমযানের এই সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারিয়ে দিবেন না।

১১। ধূমপানে আরাম ও স্বস্তি আছে অথবা তাতে কৃতিত্ব বা উদ্ভাবনী-শক্তি আছে এ ধারণা আপনার মন থেকে বের করে দিন। কারণ গবেষণা ও সমীক্ষা এর বিপরীত প্রকৃতত্বই প্রমাণ করেছে।

১২। পুনরায় ধূমপান করার জন্য আপনার মনের ভিতরে আন্দোলন সৃষ্টি হবে। অতএব সেই সময় আপনি মহান আল্লাহর এই বাণী স্মরণ করুন,

(إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা সাবধান হয়, যখন শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়। *(সূরা আ'রাফ ২০১ আয়াত)*

আর তাঁর এই বাণীও ভুলে যাবেন না,

(وَإِمَّا يَنْزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّه إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)

অর্থাৎ, আর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(ঐ ২০০ আয়াত)*

১৩। জেনে রাখুন যে, পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার প্রবণতা বেশীরভাগ ধূমপান বর্জনের প্রথম তিন মাসেই ঘটে থাকে। সুতরাং ধূমপানের দিকে আকর্ষণকারী সমস্ত ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যেমন অস্বস্তি, চিত্তচাঞ্চল্য, বিরক্তি, পরের মনস্তুষ্টি প্রভৃতি আপনাকে উত্যক্ত করে তুলতে পারে। সুতরাং এসব দূর করার জন্য আপনি বিবেকগ্রাহ্য ও বৈধ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করুন। যেহেতু ধূমপান কোন সমস্যার সমাধানকল্পে মস্তিষ্ককে সহযোগিতা করতে পারে না। আর মনে রাখুন যে, যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার উপায় সহজ করে দেবেন।

১৪। ধূমপান থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত হওয়ার পর আপনার ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে, কিছু ক্লান্তি ও অস্বস্তিবোধ দেখা দিতে পারে, কথার মধ্যে জড়তা ও মুখের ভিতরে শুষ্কতা আসতে পারে। এগুলি প্রারম্ভিকভাবে স্বাভাবিক উপসর্গ; যেহেতু আপনার দেহের মধ্যে নিকোটিন থেকে গেছে। আর এসব হল নিকোটিনের প্রতিক্রিয়া।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম নিন। এই সময় আপনি নিজেকে পরিশ্রমে ক্লান্ত করা থেকে বিরত রাখুন। ইফতারীর পর চা, কফি, পেপসী ইত্যাদি ঝাঁঝালো অথবা কফি জাতীয় পানীয় পান করা হতে দূরে থাকুন। শিথিলায়ন ব্যায়াম চর্চা ও টেনশনমুক্ত

হওয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করুন। ঘুমানোর আগে হাল্কা গরম পানি দিয়ে গোসল করুন। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

উক্ত সকল সমস্যার সমাধানকল্পে আপনি সম্ভাব্য সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করুন; মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করুন, পরহেযগারী, সংযমশীলতা, পারিবারিক সহযোগিতা ও নিজের সুদৃঢ় মনোবল ব্যবহার করুন।

১৫। সে সকল স্থানে যাতায়াত বন্ধ করুন, যেখানে ধূমপায়ীদের ধূমপান বেশী হয়। কেননা সেখানে গিয়ে আপনার মনকে আপনি স্থির নাও রাখতে পারেন। মহানবী ﷺ-এর এই বাণী স্মরণ করুন, "যে নিজেকে সন্ধিগ্ধ বিষয় থেকে দূরে রাখে সে তার দ্বীন ও ইজ্জত বাঁচিয়ে নেয়।" *(বুখারী, মুসলিম)*

১৬। দন্ত-চিকিৎসকের নিকট গিয়ে দাঁতের উপর জমাট বাধা ধূমপানের যাবতীয় পলি ও ময়লা পরিষ্কার করে নিন এবং তার সকল চিহ্ন ও দুর্গন্ধ থেকে মুক্তিলাভ করুন। অতঃপর নিয়মিত দাঁতন ও মাজন-ব্রাশ ব্যবহার করুন। আর তাতে মহানবী ﷺ-এর এই বাণী স্মরণ করুন, "দাঁতন করাতে রয়েছে মুখের পবিত্রতা এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টি।" *(নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, বুখারী বিনা সনদে, সহীহ তারগীব ২০২নং)*

১৭। এ সিদ্ধান্তও নিন যে, যে অর্থ আপনার ধূমপানে ব্যয় হতো সে অর্থ আপনি প্রত্যেক দিন নিঃস্ব ও এতীমদেরকে দান করবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

(وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً)

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর। *(সূরা মুযযাম্মিল ২০ আয়াত)*

পরিশেষে বলি যে,

১৮। যদি আপনার ধারণা থাকে যে, বিড়ি-সিগারেট খাওয়া হালাল (বা মকরূহ), তাহলে অন্যান্য বৈধ খাদ্য বা পানীয়র মত তা খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পড়েন না কেন?

১৯। যদি আপনি মনে করেন যে, বিড়ি-সিগারেট খাওয়া হালাল (বা মকরূহ), তাহলে অন্যান্য বৈধ খাদ্য বা পানীয়র মত তা খাওয়ার শেষে 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়েন না কেন?

২০। যদি আপনার ধারণা মতে বিড়ি-সিগারেট আল্লাহর দেওয়া একটি নেয়ামত হয়, তাহলে পান শেষে তা ফেলে জুতা দিয়ে দলেন কেন?

২১। যদি বিড়ি-সিগারেট সাধারণ জিনিস হয়, তাহলে তা আপনি আপনার পিতামাতা, গুরুজন অন্যান্য মান্যগণ্য মানুষের সামনে তা খান না কেন?

২২। যদি বিড়ি-সিগারেট হালাল জিনিস হয়, তাহলে তা আপনি মসজিদ বা অন্য কোন পবিত্র জায়গায় পান করেন না কেন?

২৩। যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে বিড়ি-সিগারেট খাওয়া ভালো জিনিস বা ধূমপানে আমেজ আছে, তাহলে তা খেতে আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদেরকে উৎসাহিত করেন না কেন?

২৪। সত্যবাদিতার সাথে আপনি আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন

এবং সুনিশ্চিত হন যে, আল্লাহ আপনাকে এ কাজে সহযোগিতা করবেন।

যে সদিচ্ছা আপনি পোষণ করেছেন, মহান আল্লাহ আপনাকে তা পূরণ করার তওফীক দিন। তিনিই একমাত্র প্রার্থনাস্থল।

সর্বশেষ অনুরোধ

ভাই রোযাদার! এ কথা ভুলবেন না যে, রমযানের প্রতিপালকই অন্যান্য মাসেরও প্রতিপালক। সুতরাং তাঁর আনুগত্যে আপনি অটল থাকুন এবং সর্বদা তাঁর নিয়মিত ইবাদত করতে থাকুন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, যাতে মৃত্যু অবধি আপনি এই দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন।

জেনে রাখুন যে, আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের সর্বশেষ সময় ঈদের নামায পর্যন্তই নয়; যেমন অনেকে মনে করে থাকে। বরং তা হল যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

(وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)

অর্থাৎ, ইয়াকীন আসা পর্যন্ত তুমি আল্লাহর ইবাদত কর। *(সূরা হিজ্র ৯৯ আয়াত)* আর ইয়াকীন বা একীন মানে মৃত্যু। সলফদের একজন বলেছেন, মৃত্যু ছাড়া মুসলিমের আমলের কোন শেষ সীমা নেই।

সুতরাং যদিও আপনি আনুগত্য ও ইবাদতের মাসকে এবং কল্যাণ ও দোযখ থেকে মুক্তি লাভের মৌসমকে বিদায় জানান, তবুও জেনে রাখুন যে, মহান আল্লাহ অন্য মাস ও মৌসমেও

আমাদের জন্য এমন নফল আনুগত্য ও ইবাদতের ব্যবস্থা রেখেছেন, যা পেয়ে মুসলিমের মন খুশী হবে এবং তার চক্ষু শীতল হবে। যেমন ঃ-

১। শওয়ালের ছয় রোযা।

আবু আইয়ূব ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার পরে-পরেই শওয়াল মাসে ছয়টি রোযা পালন করে, সে ব্যক্তির পূর্ণ বৎসরের রোযা রাখার সমতুল্য সওয়াব লাভ হয়।" *(মুসলিম ১১৬৪ নং, আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

বলাই বাহুল্য যে, যদি আপনার ফরয রোযা বাকী থাকে, তাহলে তা কাযা করার পর এই রোযা রাখুন।

২। প্রত্যেক মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখে, হজ্জ না করলে আরাফার দিনে, আশূরার দিনে এবং প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখুন।

৩। প্রত্যেক রাত্রে তাহাজ্জুদের নামায ও বিত্র পড়ুন এবং এর ফলে সেই সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হন, যাঁদের সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন,

(كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ)

অর্থাৎ, তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়। *(সূরা যারিয়াত ১৭ আয়াত)*

৪। ফরয নামাযের আগে-পরে যে ১২ রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আছে, তা নিয়মিত আদায় করুন।

৫। নিয়মিত প্রত্যেকদিন কুরআন তেলাঅত করুন।

৬। প্রত্যেক ভালো কাজে অংশগ্রহণ করুন এবং আল্লাহর আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকুন। মহান আল্লাহ বলেন,

(فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ)

অর্থাৎ, অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছে সুদৃঢ় থাক এবং সেই লোকেরাও যারা তওবা করে তোমার সাথে রয়েছে। *(সূরা হূদ ১১২ আয়াত)*

৭। বিনয় ও কাকুতি-মিনতির সাথে আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যাতে তিনি আপনাকে ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রাখেন এবং ইসলামের উপর মরণ দেন। তওহীদের কালেমার উপর যেন প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আল্লাহর রসূল ﷺ দুআ করতেন,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلى دِيْنِكَ.

উচ্চারণঃ- ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলূবি সাব্বিত ক্বালবী আলা দীনিক।

অর্থঃ- হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। *(তিঃ, সঃ জামে' ৬/৩০৯)*

আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য অনেক আছে এবং তার সওয়াবও আছে অনেক অনেক। মহান আল্লাহ বলেন,

(مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) النحل:٩٧

অর্থাৎ, মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে

তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। *(সূরা নাহল ৯৭ আয়াত)*

সুতরাং ভাইজান! অবিরত আল্লাহর ইবাদতে রত থাকুন। সাবধান! মৃত্যু যেন পাপরত অবস্থায় আপনাকে আক্রমণ না করে। আর জেনে রাখুন যে, আপনার রমযানের রোযা কবুল হওয়ার লক্ষণই হল এই যে, আপনি তার পরেও ভালো কাজ বর্জন করবেন না। ভালোর পশ্চাতে ভালো আসে এবং মন্দ মন্দকে আকর্ষণ করে। পরিশেষে দুআ করুন আল্লাহর কাছে আপনার ও আমাদের জন্য ঃ-

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا صِيَامَنَا وَقِيَامَنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم، اَللّٰهُمَّ اغْفِـــرْ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْم، اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيْل، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّار، اَللّٰهُمَّ احْشُرْنَا مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقَا، اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنَا بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيْم، فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّلاَ فِتْنَةٍ مُّضِلَّة، اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الإِيْمَان، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْن، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْن.

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকট থেকে আমাদের রোযা ও নামায কবুল করে নাও। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি চরম ক্ষমাশীল পরম দয়াবান। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতে কল্যাণ দান কর। আর দোযখের আযাব থেকে রক্ষা

কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তাদের সাথে কিয়ামতে হাশর করো, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ; নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহগণের সাথে। আর তাঁরা হলেন উত্তম সাথী। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার সম্মানিত মুখমন্ডল দর্শনে পরিতৃপ্ত করো; বিনা কোন কষ্ট ও ক্ষতিতে, কোন ভ্রষ্টকারী ফিতনায়। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমন্ডিত কর এবং আমাদেরকে হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত কর; তোমার করুণায় হে শ্রেষ্ঠ করুণাময়! আমীন।

وصلى اللّٰه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

সংকেত-পরিচিতি ও প্রমাণপঞ্জী

১। আঃ= আহমাদ, মুসনাদ
২। আআসাঈঃ = আসইলাতুন অআজবিবাতুন ফী স্বালাতিল ঈদাঈন
৩। আদাঃ = আবূ দাউদ
৪। আসাইঃ = আহকামুস সাওমি অল-ই’তিকাফ, মঃ আব্দুল হাদী
৫। ইআইঃ, ইআইআসিঃ = ইতহাফু আহলিল ইসলাম বিআহকামিস সিয়াম, জারুল্লাহ আলি জারুল্লাহ
৬। ইআশাঃ = ইবনে আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ
৭। ইখুঃ= ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ
৮। ইগঃ= ইরওয়াউল গালীল, আলবানী
৯। ইফিঃ = আল-ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়্যাহ
১০। ইমাঃ = ইবনে মাজাহ
১১। ইহিঃ= ইবনে হিব্বান, সহীহ
১২। কাঃ = আল-কাবায়ের, যাহাবী
১৩। কানামিরাঃ = কাই নাস্তাফীদা মিন রামাযান, ফাহদ বিন সুলাইমান
১৪। কানারাঃ = কাইফা নাঈশু রামাযান, আব্দুল্লাহ আস-সালেহ
১৫। কিসাঃ = কিতাবুস সালাহ, ইবনুল কাইয়্যেম
১৬। কুঃ= কুরআন মাজীদ
১৭। তাইরাঃ = তাযকীরু ইবাদির রাহমান, ফীমা অরাদা বিসিয়ামি শাহরি রামাযান, ইয়াকূব বিন ইউসুফ
১৮। তাফাসাসাঃ = তাওজীহাতুন অফাওয়াএদ লিসসা-য়েমীনা অসসায়েমাত
১৯। তামিঃ = তামামুল মিন্নাহ, আল্লামা আলবানী

২০। তিঃ = তিরমিযী
২১। ত্বাবঃ বা ত্বাবাঃ= ত্বাবারানী, মু'জাম
২২। দারাঃ= দারাক্বুত্বনী, সুনান
২৩। দুরাঃ = দুরূসু রামাযান অকাফাত লিস্‌-সায়েমীন, সালমান বিন ফাহদ আল-আওদাহ
২৪। নাঃ = নাসাঈ
২৫। নাআঃ = নাইলুল আওতার, ইমাম শওকানী
২৬। ফবাঃ = ফাতহুল বারী
২৭। ফামুতাসি ঃ = ফাতাওয়া মুহিম্মাহ, তাতাআল্লাকু বিস্‌সিয়াম, ইবনে বায
২৮। ফারারাঃ = ফাইযুর রাহীমির রাহমান, ফী আহকামি অমাওয়াইযি রামাযান, আব্দুল্লাহ ত্বাইয়ার
২৯। ফাসিঃ = ফাতাওয়াস সিয়াম, আল-মুসনিদ
৩০। ফিযাঃ = ফিকহুয যাকাত, ইউসুফ কারযাবী
৩১। ফিসুঃ = ফিকহুস সুন্নাহ, সাইয়েদ সাবেক
৩২। ফুসিতাযাঃ = ফুসূলুন ফিস্‌-সিয়ামি অত্‌-তারাবীহি অয্‌-যাকাহ, ইবনে উষাইমীন
৩৩। বাঃ = বাইহাকী
৩৪। বুঃ = বুখারী
৩৫। মাঃ= মালেক, মুঅত্তা
৩৬। মাফাঃ = মাজমূ' ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ
৩৭। মাবাঃ = মাজাল্লাতুল বায়ান
৩৮। মাযাঃ = মাজমাউয যাওয়াএদ
৩৯। মাশারাঃ = মাজালিসু শাহরি রামাযান, ইবনে উষাইমীন
৪০। মুঃ = মুসলিম
৪১। মুমঃ = আশ্‌শারহুল মুমতে', ইবনে উষাইমীন
৪২। যাসাঃ, যাসাফাকাঃ = যাদুস সায়েম অফাযলুল ক্বায়েম

৪৩। রিমুযাসিঃ = রিসালাতানি মু’জাযাতানি ফিয যাকাতি অস্‌সিয়াম, ইবনে বায

৪৪। সআদাঃ = সহীহ আবূ দাঊদ, আলবানী

৪৫। সইমাঃ = সহীহ ইবনে মাজাহ, আলবানী

৪৬। সজাঃ = সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী

৪৭। সতাঃ = সহীহ তারগীব, আলবানী

৪৮। সতিঃ = সহীহ তিরমিযী, আলবানী

৪৯। সনাঃ = সহীহ নাসাঈ, আলবানী

৫০। সারাঃ = সাওমু রামাযান, আব্দুর রাযযাক নাওফাল

৫১। সালাতাঃ = সালাতুল-লাইলি অত্‌-তারাবীহ, ইবনে বায

৫২। সিসঃ= সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী

৫৩। সুআঃ = সুনানে আরবাআহ; আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ

৫৪। হাঃ= হাকেম, মুস্তাদ্‌রাক

৫৫। হাসাঃ = হাদিয়্যাতুস লিস-সায়েমীন

৫৬। ৪৮ = ৪৮ সুআলান ফিস্‌-সিয়াম, ইবনে উষাইমীন

৫৭। ৭০ = ৭০ মাসআলাহ ফিস্‌-সিয়াম, মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

রমযানের প্রত্যাদেশ

রোযাদার ভাইজান! মনে মনে ভাবুন, এটাই আপনার সর্বশেষ রোযা।

এই বিশ্বাসের উপর আপনি আপনার লক্ষ্য স্থির করুন এবং তা আপনার নীতি মেনে এ মাসে তার অনুসরণ করুন।

অবশ্যই আপনার অবস্থার পূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে এবং আল্লাহ-অভিমুখী হওয়ার ফলে আপনি নিজের মধ্যে আশ্চর্যজনক সংস্কার লক্ষ্য করবেন।

সুতরাং তড়িঘড়ি করে সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। হয়তো বা এ সুযোগ আর দ্বিতীয়বার হাতে আসবে না।

মুবারক ভাইজান! আল্লাহর ফযীলতপূর্ণ দিনসমূহে যে ব্যক্তি তাঁর পুরস্কার লাভের তওফীক লাভ করবে এবং তাতে বিভিন্ন নৈকট্যদাতা আমলের মাধ্যমে মেহনত ও পরিশ্রম করবে, সেই অর্জন করবে প্রচুর কল্যাণ।

প্রিয় ভাইজান!

আমাদের লক্ষ্য এই যে, আমাদের অবস্থা যেন এ মাসে পূর্ব থেকে ভালো হয়।

আমরা চাই, এ বছরের রোযা যেন আমাদের জীবনের পার্থক্যকারী এক নিদর্শন হয়। এ বছরের রোযা যেন আমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় এবং এই পরিবর্তন নিয়েই আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি।

আল-হামদু লিল্লাহ! আমরা আপনার জন্য উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সহযোগী ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান এ পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করলাম।

আল্লাহ আপনাকে এই মাস পূর্ণরূপে পাওয়ার ও পরিপূর্ণরূপে তার যাবতীয় কর্তব্য পালন করার তওফীক দিন। তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনাস্থল। আমীন।

ভাই যুবক!

আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন সূর্য সৃষ্টির অতি নিকটে ১ মাইল দূরত্বে থাকবে। ফলে তাদের কষ্টের সীমা থাকবে না; যেমন ঘামও হবে প্রচন্ড। কিন্তু এই ভীষণ দিনে মহান আল্লাহ যাদেরকে তাঁর ছায়াদানে পুরস্কৃত করবেন, তাদের মধ্যে একজন হল, সেই যুবক যে আল্লাহর আনুগত্যে প্রতিপালিত হয়। সুতরাং আপনার সেই যুবক হতে বাধা কিসের?

প্রিয় ভাইজান!

নিজের জীবনের হিসাব-নিকাশ পুনরায় ফিরিয়ে দেখুন। সঠিক পথ অবলম্বন করুন। এই মাসকে আপনার সেই পথে পৌঁছনোর অসীলা হিসাবে গ্রহণ করুন।

হে আল্লাহ! তুমি এই মাসকে আমাদের জন্য সুপথের প্রথম মঞ্জিল কর। আমীন।

((وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ))

(٣١) سورة النـور

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

ভাই মুসলিম! আপনার রব্ব আপনাকে আহবান করছেন, আপনার সফলতা ও মঙ্গলের জন্যই।

সুতরাং তাঁর আহবান থেকে আপনি কত দূরে?

সত্বর সাড়া দিন। তওবা করুন তাঁর নিকটে সকল ফরয আদায় করবেন বলে অঙ্গীকার করে।

সকল সময়ে তাঁর নিষিদ্ধকৃত বস্তু বর্জন করবেন এবং সদা-সর্বদা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে।

আপনি আপনার জীবনকে আগের তুলনায় আশানুরূপ উত্তম পাবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তা পাবেন, যা আপনার কল্পনায় ছিল না।

কারণ, আপনি আপনার তওবার ফলে হবেন সফলকাম।